দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৮ ঈসায়ী

আল-জিহাদ আর্কাইভ-২০১৮

দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের

নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৮ ঈসায়ী

সূচিপত্র

সারা দুনিয়ার বর্তমান জিহাদের মূল গোড়া হলো ইমারাতে ইসলামিয়্যাহ আফগানিস্তান ৫

ফি সাবিলিল্লাহ ও তাবলীগ - মাওলানা পালনপুরী (দা বা) ৯

জিহাদ ছেড়ে অন্য কাজে মশগুল হওয়া ১৭

গোয়ান্তানামোর বন্দী সাথীদের কিছু স্বপ্ন ২১

সংগঠনে যুক্ত সম্মানিত ভাইদের প্রতি - আপন হৃদয় কুটিরে জমে থাকা রসকসহীন কিছু কথা ২৬

জঙ্গিবাদ জিন্দাবাদ ৩৬

ইমাম ছাড়া জিহাদ নাই ৩৯

দাম্ভিক আমেরিকার পতনের গল্প শোন ৪৯

যারা আমীরের দোহাই দেয়!!! ৫৫

গণতন্ত্রের মাধ্যমে কি ইসলামী বিপ্লব সম্ভব? ৫৯

মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ব্যাপারে সালাফগণের অবস্থান –সত্যিকারের খারেজি কারা? ৬৫

বর্তমান মুসলিমপ্রধাণ রাষ্ট্রগুলো দারুল হারব কেন? ৬৯

শহীদী অভিযানের ব্যাপারে ইসলামের নীতি ৯৪

জামাআহ্ প্রসঙ্গ: কিছু মৌলিক কথা ৯৯

যে গাফেলতির ফল হিসেবে আমরা পেলাম রক্ত মাখা জিল্লতি! ১০৯

তাগুতি চক্রান্তের যে জঘন্য নকশা আমাদের অজানা! ১১৫

রুপপুর পারমাণবিক প্রকল্প এবং ভারতের নীল নকশা! ১২০

সফলতা কোথায়??? ১২৭

জিহাদী মিডিয়ার গুরুত্ব - শাইখ আবু কাতাদাহ (হাফি:) ১২৯

আসেন, আমরা চিন্তা করে দেখি - যদি আমি ভুল হই!.....১৩৫
কিছু কথা আমার জন্য এবং আমার প্রিয় ভাইদের জন্য ১৩৯
জিহাদে অংশগ্রহণের ৪৪টি উপায়। ১৪৪
প্রিয় ভাইদের প্রতি পড়ে দেখার অনুরোধ ১৪৬
জি ভাই, ভিডিও এডিটিং এর কাজ তো করতে চাই ... কিন্তু কীভাবে?.....১৫৩

সারা দুনিয়ার বর্তমান জিহাদের মূল গোড়া হলো ইমারাতে ইসলামিয়্যাহ আফগানিস্তান

কালো পতাকা

Senior Member

০১-২১-২০১৮

শায়খ নাসির আল ফাহদ। সৌদী কারাগারে বন্দি এক মুজাহিদ আলেম, আল্লাহ তাঁকে মুক্ত করুন। তিনি একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন, 'আততিবয়ান ফী কুফরি মান - আয়ানাল আম্রিকান' (আমেরিকার সাহায্যকারীদের সুস্পষ্ট কুফরি) দুই খন্ডে রচিত এই আরবী গ্রন্থে তিনি আমেরিকাকে সাহায্য সুস্পষ্ট কুফরি বলেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা যখন তাঁর বান্দাদেরকে মহান বিজয় দান করতে চান, তখন এদের মধ্যে পরিশোধন করে নির্বাচিত প্রিয় বান্দাদের হাতেই বিজয় দান করেন। এই কথার উপর তিনি কয়েকটি উদাহরণও দেন, যেমন হযরত দাউদ - আলাইহিস সাল্লামের সময় আল্লাহ যখন তালেতের হাতে জালুতকে পরাজিত করতে চাইলেন, তখন এরমধ্যে পরিশোধন করলেন।

প্রথমে তালুতের বিশাল একটি বাহিনী যুদ্ধের জন্যে বের হয়েছিল, যাদের মধ্যে অনেক ভেজালীসুবিধাবাদীও ছিলো। আল্লাহ পথিমধ্যে নদী দ্বারা পরীক্ষা করে - এদের মধ্যে ভেজালী সুবিধাবাদীদের বের করে মাত্র তিনশত তেরজনকে নির্বাচিত করেন। পরে এদের হাতেই জালুতকে পরাজিত করে মহান বিজয় দান করলেন। এমনিভাবে বদরযুদ্ধেও আল্লাহ তাআলা অনেক ছাটাইয়ের পর নির্বাচিত বান্দাদের হাতেই মক্কার কাফিরদের পরাজিত করেন। বদরযুদ্ধের পর যখন আব্দুল্লাহ বিন উবাই মুনাফিকরা বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করলো, তখন আল্লাহ তাআলা উহুদদ্বারাই খন্দকযুদ্ধের মাধ্যমে ছাটাই করলেন। পরে নির্বাতিত বান্দাদের- মক্কা বিজয় সম্পন্ন হলো।

পরে যখন আল্লাহর ইচ্ছা করেন, রূমপারস্য মুসলমানদের হাতে বিজিত করবেন-, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকাল হয়ে গেলো। সাথে সাথে অনেক ফেতনার জন্ম হলো, যাকাত অস্বীকারকারী, ইসলাম ত্যাগকারী, নবুওতদাবিকারীসহ অনেক ফেতনা দেখা দিল। তখন হযরত আবু বকর

রাজিয়াল্লাহু আনহুমের নেতৃত্বে চললো ছাটাই, আল্লাহ করলেন পরিশোধন, পরে এই নির্ভেজাল, খাঁটি ঈমানদার হাতে রূমপার-স্য বিজয় সম্পন্ন হয়। শায়খের কথা এখানেই শেষ।

এবার আমরা যদি শায়খের কথাকে একটি প্রাথমিক মূলনীতি হিসেবে দাঁড় করাই, তাহলে ইতিহাসে ও বর্তমানে এর অনেক মিল খুঁজে পাই।

যেমনক্রুসেডযুদ্ধের সময় যখন সুলতান ইমাদুদ্দীন জঙ্গী ও নুরুদ্দীন জঙ্গীর - নেতৃত্বে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে একের পর এক হামলা শুরু হলো, আর ক্রুসেডাররা বিভিন্ন হামলায় পর্যুদস্ত হয়ে অনেক শহর ও কেল্লা ছেড়ে পালালো, তখন অনেক ভেজালী ও সুবিধাবাদীরা এই মোবারক জিহাদে শরীক হতে লাগলো। পরে যখন নুরুদ্দীন জঙ্গির ইন্তেকাল হলো, তখন এসব ভেজালীরা বিভিন্ন এলাকায় স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করে ক্রুসেডারদের তল্পীবাহক হয়ে ব্যবহৃত হতে লাগলো। তখন উপায়ান্তর না দেখে সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবী এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন, পরে যখন মুবারক বাহিনী এই ভেজাল থেকে মুক্ত হলে গেলো, তখন আল্লাহ তাআলা সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর নেতৃত্বে নির্ভেজাল মুজাহিদদের হাতে বায়তুল মুকাদ্দসের বিজয় দান করলেন।

এভাবে আমরা যদি বর্তমান জিহাদের দিকে তাকাই, তাহলে দেখতে পাই যে, সারা দুনিয়ার বর্তমান জিহাদের মূল গোড়া হলো আফগান জিহাদ। আর আফগান জিহাদ প্রথমে শুরু হয়েছিল কম্যুনিষ্ট সরকারের বিরুদ্ধে, পরে এই সরকারকে রক্ষা করতে রাশিয়া আফগানে সৈন্য মোতায়েন করে, যেভাবে আসাদকে রক্ষা করতে রাশিয়া সিরিয়ায় সৈন্য পাঠিয়েছিল। সরকারের বিরুদ্ধে এই জিহাদ শুরু হওয়ার কারণে অনেকেই এটাকে গৃহযুদ্ধ বলে চালিয়ে দেন, যার কারণে মুজাহিদদের সংখ্যা প্রথমদিকে কম ছিলো। পরে যখন বিজয় আসা শুরু হলো, তখন জিহাদের নামে দলে দলে অনেক ভেজালি এই যুদ্ধে শরীক হলো। যেহেতু এই জিহাদ শুরু হয়েছিল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, আল্লাহ চাচ্ছেন না এই ইসলামি শাসন এইসব ভেজালিদের হাতে প্রতিষ্ঠা হোক। সুতরাং শুরু হলো তাদের মধ্যে কাইজ্যা, লড়াই, গৃহযুদ্ধ। যারা কাল ছিল মুজাহিদ, আজ তারা হলো ডাকাত। ঠিক তখুনি আল্লাহ দাঁড় করালেন তালেবানদের মতো একদল নির্ভেজাল মুজাহিদদের, পরে এদের হাতেই প্রতিষ্ঠিত হয় ইমারাতে ইসলামিয়্যাহ

আফগানিস্তান।

তালেবানরা যখন শহরের পর শহর জয় করা শুরু করলো, বিজয়ের পর বিজয় রচনা করতে লাগলো। তখন অনেক সুবিধাবাদী তালেবানদের সমর্থক হতে লাগলো। বাংলাদেশেও তখন অনেকে তালেবানদের আদলে ইসলাম প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়ে বলেছিলেন, 'বাংলা হবে আফগান আর আমরা হবো তালেবান'! বিজয়ীদলে যোগ দিতে কার না ভালো লাগে? ঠিক তখন তালেবানদের উপর আসলো বিরাট পরীক্ষা, যাতে তালেবানদের মধ্যে থেকে ভেজালীরা পৃথক হয়ে যায়।

আমেরিকার নেতৃত্বে বিশ্বের সব দালালকুফরী শক্তি হামলা-মুরতাদ-মুনাফেক-চালালো তালেবানদের প্রতিষ্ঠিত ইমারাতে। এতে ভেজালী তালেবানরা ক্রমান্বয়ে সরে যেতে আরম্ভ করলো, তালেবানদের সংখ্যা কমতে কমতে পনের হাজারে এসে ঠেকলো। কিন্তু প্রকৃত তালেবানরা এই ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যেতে থাকলো। আজ এই নির্ভেজাল তালেবানদের হাতেই আমেরিকা মার খাচ্ছে। এদিকে তালেবানদের বিজয় দেখে অনেকে বুঝে না বুঝে জিহাদী হতে লাগলো। যাকে ইচ্ছা তাকে কাফির ফতোয়া দেওয়া শুরু করলো, আর সব দোষ এসে চাপলো তালেবানআলকায়েদার ঘাড়ে।- এখন প্রয়োজন এই তাকফীরীদেরকে মুজাহিদদের থেকে পৃথক করা। ব্যস, এসে গেলো আইএস। তারা পৃথক করে দিল তাকফীরী আর মুজাহিদদের মধ্যে, সবাই বুঝে গেলো কারা মুজাহিদ আর কারা খারেজি।

এই ধারাবাহিকতায় পরিশোধন হচ্ছে বাংলাদেশেও। রাশিয়াবিরোধী আফগান জিহাদ থেকে শুরু করে তালেবান শাসন পর্যন্ত আফগানিস্তানের এ পরিবর্তন বাংলাদেশেও এসে প্রভাব ফেলেছে।

বাংলাদেশে নতুনমাত্রার জিহাদের জন্ম হয় শাপলাচত্বরের পর। অনলাইনে এদের উপস্থিতি ছিল বেশি, শায়খ উসামার ছবি আর একটি জিহাদী পোষ্টের জন্যে শতাধিক লাইক বরাদ্দ ছিলো। লাফিয়ে লাফিয়ে জিহাদিদের সংখ্যা বাড়তে লাগলো। এ সুযোগে অনেক সুবিধাবাদীরাও জিহাদী সাজলো।

সুতরাং প্রয়োজন এদের মধ্যেও পরিশোধন। এই পরিশোধনের প্রথম পর্ব শুরু হয়েছিল বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে শায়খ আইমান জাওয়াহিরি হাফিজাহুল্লাহের বার্তার দ্বারা। অনেক তথাকথিত জিহাদী তখন এটাকে হাওয়ায়ী বলে ছিটকে পড়ে।

২য় পরিশোধন হয় একিউআইএসের ঘোষণা দ্বারা, অনেকে জিহাদ ও মুজাহিদকে সাপোর্ট করতো, তবে এগুলো আফগানসিরিয়ার জন্যে-, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তাদের বুঝে আসে নি, তাই তারাও ছিটকে পড়ে।

এবার ৩য় পরিশোধন হলো, লক্ষাধিক আলেমের স্বাক্ষরিত ফতোয়ার দ্বারা। এর দ্বারা ওইসব জিহাদিরা ছিটকে পড়লো, যারা জিহাদ ও মুজাহিদদের পছন্দ করে, এদের কল্যাণ চায়, তবে মুজাহিদ উলামা ও উমারাদের মতো জিহাদ চায় না, তারা চায় যারা জীবনে কোনোদিন জিহাদে যান নি, জিহাদমুজাহিদদের নিয়ে যাদের - কোনো স্বচ্ছ ধারণা নেই, তাদের জিহাদ। সর্বোপরি উনাদের নিজেদের সুবিধামতো জিহাদ, অথচ তাদের না আছে প্রচলিত জিহাদের প্রকৃত ধারণা আর না জানে মুজাহিদদের প্রকৃত অবস্থা। এবার এরাও ছিটকে পড়লো।

এভাবে ছাটাই আর পরিশোধন চলতে থাকবে, তবেই না আল্লাহ ইমাম মাহদী প্রকৃত বাহিনী তৈরী করবেন, যাদের মাধ্যমে আল্লাহ মহান বিজয় দিবেন। আমার মনে হয়, এইসব ভেজালি সুবিধাবাদী জিহাদীরা পরে চলে যাওয়ার চেয়ে এখুনি চলে যাওয়া ভালো, এরা পরে যদি আব্দুল্লাহ বিন উবাই যেভাবে উহুদযুদ্ধ থেকে তিন শত সৈন্য নিয়ে ফিরে এসেছিল, এরাও যদি পরে মুজাহিদদের দুর্দিনে পল্টি মারে তাহলে বর্তমানের চেয়ে ওটা হবে ভয়াবহ। তাই এরা এখন ছিটকে পড়ে এদেশের জিহাদ ও মুজাহিদদের উপর রহম করলো।

এদের স্মরণে কুরআন কারীমের কিছু কথা-

... আর যদি তারা বের হবার সংকল্প নিত, তবে অবশ্যই কিছু সরঞ্জাম প্রস্তুত করতো। কিন্তু তাদের উত্থান আল্লাহর পছন্দ নয়, তাই তাদের নিবৃত রাখলেন এবং আদেশ হল বসা লোকদের সাথে তোমরা বসে থাক।

যদি তোমাদের সাথে তারা বের হত, তবে তোমাদের অনিষ্ট ছাড়া আর কিছু বৃদ্ধি করতো না, আর অশ্ব ছুটাতো তোমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশে। আর তোমাদের মাঝে রয়েছে তাদের গুপ্তচর। বস্তুতঃ আল্লাহ যালিমদের ভালভাবেই জানেন।[৪৭-৪৬ :সুরা তাওবাহ]

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৮৭৪৭

ফি সাবিলিল্লাহ ও তাবলীগ - মাওলানা পালনপুরী (বা দা)

মোল্লা ওমর

Senior Member

০৭-০৫-২০১৮

প্রশ্ন—আল্লাহর রাস্তার আম ও খাস কোন অর্থ আছে কি ?আল্লাহ রাস্তা বিষয়ক হাদিসগুলো কি শুধুই জিহাদের জন্য প্রযোজ্য এবং আল্লাহর রাস্তায় বের হলে যে ফজিলতগুলো বর্নিত হয়েছে এগুলো কি শুধুই জিহাদের জন্য প্রযোজ্য??

আর এই ফজিলত কি তাবলিগের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য নয় কি??? জাযাকাল্লাহ খায়ের। (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক)

#উত্তর —

জিহাদ সংক্রান্ত কিছু সংশয় নিরসন—মুফতী সাইদ আহমাদ পালনপুরী (হাফিযাহুল্লাহ)

শাইখুল হাদীস ও মুফতী, দারুল উলুম দেওবন্দ

জিহাদ কুরআন ও হাদিসের একটি বিশেষ পরিভাষা। তাঁর অর্থ হল দ্বীন ইসলামের প্রতিরক্ষা ও সমুন্নত করার লক্ষ্যে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করা।

শব্দ বিবেচনায় জিহাদ শব্দটির দু ধরনের ব্যবহার পাওয়া যায়,

১) **جاهد العدو مجاهدة جهادا**

অর্থাৎ শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করা

২) **جاهد في الامر**

কোন কাজে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা ও প্রানান্তকর প্রচেষ্টা চালানো।

এই অর্থেই বলা হয়ে থাকে মোজাহাদা।

কুরআন ও হাদীসে জিহাদ শব্দের বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার পাওয়া যায়, কোথাও শুধু **جهاد و مجاهدة** এসেছে। কোথাও তার পরে **في سبيل الله** (ফি

সাবিলিল্লাহ—অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায়) যুক্ত হয়েছে। কোথাও আবার **الله في**(ফি আল্লাহ) ও **فينا** যুক্ত হয়েছে।

এমনকি **سبيل الله** (সাবিলিল্লাহ) শব্দটিও কখনো একাকী ব্যবহার করা হয়েছে কখনো **جهاد** এর সাথে মিলে ব্যবহৃত হয়েছে।

এক্ষেত্রে জিহাদের অর্থ বিভ্রাট থেকে বাঁচার জন্যে একটি একটি মূলনীতি অনুসরণ করা যেতে পারে। যা মূলত নুসূসের আলোকে গৃহিত ও অধিক নিরাপদ। এতে ভয়াবহ বিভ্রান্তি ও অনর্থক ভোগান্তি থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে ইনশা আল্লাহ।

যেখানে শুধু **مجاهدة** শব্দ এসেছে কিংবা তারপর **الله في** (ফি আল্লাহ) বা **فينا** এসেছে, সে আয়াতগুলো "আম" (ব্যাপক)। অর্থাৎ সেখানে জিহাদ শব্দটির আভিধানিক যে অর্থে ব্যাপকতা আছে তা উদ্দেশ্য হতে পারবে। যেমন আল্লাহর বাণী—

وجاهدوا في الله حق جهاده

অর্থঃ আর তোমরা আল্লাহর পথে সর্বশক্তি ব্যয় করো। (সূরা হজ্জ, আয়াত ৭৮) অর্থাৎ 'যারা আল্লাহর দ্বীনের জন্য পূর্ণশক্তি ব্যয় করে'। অনুরূপ আল্লাহর বাণী—

والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين

অর্থঃ যারা আল্লাহর দ্বীনের জন্য প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালায় আমি তাদের বহু পথের সন্ধান দেই। (সূরা আনকাবূত, আয়াত ৬৯)

এই আয়াতদ্বয় এবং এ জাতীয় অন্যান্য আয়াত দ্বীনের সকল প্রচেষ্টাকে শামিল করে। যে কেউ যে কোনো পদ্ধতিতে দ্বীনের জন্য কোন প্রচেষ্টা করবে, সে এই আয়াতগুলোর উদ্দেশ্য হতে পারবে।

কিন্তু যেখানে জিহাদ শব্দ এসেছে কিংবা **مجاهدة** মূল ধাতুর সাথে **في سبيل الله** (ফি সাবিলিল্লাহ) যুক্ত হয়েছে, অথবা কোথাও শুধু **في سبيل الله** (ফি সাবিলিল্লাহ) বলা হয়েছে (যেমনটা যাকাতের হক্বদার ও আল্লাহর রাস্তায় খরচের

আলোচন্যা এসেছে)—এ সকল আয়াত দ্বারা **جهاد** (জিহাদ) এর খাস (বিশেষ) অর্থ (অর্থাৎ যুদ্ধ) উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

এ কারণেই সূরা তাওবাহর যেখানেই **جهاد** শব্দ এসেছে সেখানেই শাহ আব্দুল কাদের দেহলবী (রহঃ) এবং তার অনুসরণে শাইখুল হিন্দ (রহঃ) যুদ্ধ করা অর্থ লিখেছেন।

এমনিভাবে হাদিস গ্রন্থগুলোতে **ابواب الجهاد** ও **فضائل الجهاد** নামে যে শিরোনাম গুলো এসেছে সেখানেও এই বিশেষ অর্থ উদ্দেশ্য। আপনি চিন্তা শক্তিকে জাগ্রত রেখে অধ্যায়গুলো পাঠ করুন। দেখবেন **في سبيل الله** (ফি সাবিলিল্লাহ) এর বর্ননাগুলো যেখানে উল্লেখ আছে, সেখানেই জিহাদ উদ্দেশ্য।

এতে বোঝা গেল **في سبيل الله** (ফি সাবিলিল্লাহ) শব্দটিও ইসলামের একটি বিশেষ পরিভাষা। যার সুনির্দিষ্ট অর্থ হল আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করা। কিন্তু শত দুঃখের বিষয় আমাদের তাবলীগী ভায়েরা এই আয়াতগুলোকে "আম" (ব্যাপক) করে দিয়েছেন।

এমনকি শুধু "আম"ই নয় বরং নিজেদের সাথে "খাস" (সীমাবদ্ধ) করে নিয়েছেন। কারণ তারা দ্বীনের কাজগুলোর মধ্যে শুধু তাবলীগকেই জিহাদ বলেন। অন্যান্য দ্বীনি কাজ যেমন তা'লীম, তাদরীস, তাফসীর, তা'লিফ ইত্যাদি কিছুকেই জিহাদ বলেন না।

বরং তাবলীগের কিছু সাধারণ সাথী ভাই তো এমন আছে, যারা এগুলোকে দ্বীনের কাজই মনে করে না। আর যখন তারা নিজেদের কাজকেই জিহাদ নাম দিয়ে দিয়েছে তখন কুরআন ও হাদিসের জিহাদের যেসব ফজিলত বর্ণিত হয়েছে তা ঢালাওভাবে নিজেদের কাজের জন্য ব্যবহার করা শুরু করেছে।

আজ বাধ্য হয়ে শত আক্ষেপের সাথে বলতে হয় তাবলীগী ভাইদের এই কাজগুলো কোনভাবেই সহীহ হচ্ছে না।

জিহাদ ইসলামের একটি বিশেষ পরিভাষা। কুরআন ও হাদীসে যখন এই শব্দ উল্লেখ করা হয় তখন এর দ্বারা **قتال في سبيل الله** (ক্বিতাল ফি সাবিলিল্লাহ) উদ্দেশ্য হয়।

তবে হ্যাঁ কিছু কিছু কাজকে জিহাদের সাথে মিলানো হয়েছে। এ মিলানোটুকুই এ কাজগুলোর ফজিলতের জন্য যথেষ্ট। যেমন হাদীসে আছেঃ

রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেন যে ইলমের খোঁজার জন্য বের হয় সে ফিরে আসা পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় আছে।'

এখানে রাসূলুল্ললাহ সাঃ ইলম অন্বেষণের পথকে **في سبيل الله** (ফি সাবিলিল্লাহ) আখ্যা দিয়ে জিহাদের সাথে তুলনা করলেন। এই তুলনা করাটাই তালেবে ইলমের জন্য ফজিলত। এর থেকে আগে বাড়ার কোন অধিকার কারো নেই।

এমনিভাবে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজকেও **في سبيل الله** (ফি সাবিলিল্লাহ) এর সাথে মিলানো যেতে পারে। আর মিলানোটাই তার ফজিলত হবে।

কিন্তু তাই বলে জিহাদের সমস্ত ফজিলত তার সাথে প্রয়োগ করা **في سبيل الله جهاد** (জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ) কে তাবলীগের সাথে 'খাস' করা বা **في سبيل الله** (ফি সাবিলিল্লাহ) কে 'আম' করে তাবলীগকেও এর উদ্দেশ্য বানানো সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন দাবি ছাড়া আর কিছুই নয়। এ কথাগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সর্বদা স্মরণ রাখা জরুরী।

মোট কথা এই **في سبيل الله** (ফি সাবিলিল্লাহ) পরিভাষাটি কুরআন ও হাদীসে 'আম' (ব্যাপক) না 'খাস' (বিশেষ) এ ব্যাপারে মতানৈক্য আছে। তবে আলোচনা পর্যালোচনার পরে মাসরাফে যাকাতের (যাকাতের ব্যয়ের খাত) আলোচনায় এই কথাই সিদ্ধান্ত হয়েছে যে **في سبيل الله** (ফি সাবিলিল্লাহ) একটি বিশেষ পরিভাষা অর্থাৎ 'খাস' এবং সকল মুহাদ্দিসীনের কর্ম পদ্ধতিও এটাই ছিল (অর্থাৎ সকল মুহাদ্দিসীন ফি সাবিলিল্লাহকে কে বিশেষ পরিভাষা হিসেবে ব্যবহার করেছেন)।

তারা সকলেই **في سبيل الله** (ফি সাবিলিল্লাহ) শব্দ সম্বলিত সকল হাদীসকে কিতাবুল জিহাদ অর্থাৎ জিহাদ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। তার মানে তাদের নিকটও এটা বিশেষ পরিভাষা এবং এর সাথে সম্পৃক্ত ফযিলতসমূহ একটি বিশেষ কাজের জন্য নির্ধারিত।

কিন্তু তাবলীগ জামাতের ভাইয়েরা **في سبيل الله** (ফি সাবিলিল্লাহ) সংক্রান্ত হাদীসগুলোকে 'আম' করে ফেলেছেন। বরং তারা নিজেদের কাজকেই ঐ সকল হাদীসের مصداق বা প্রয়োগ ক্ষেত্র সাব্যস্ত করেছেন।

তারা মেশকাতুল মাসাবীহ হাদীসের কিতাব থেকে তাবলীগী কাজের জণ্য যে মুস্তাখাব নির্বাচিত সংকলন রচনা করেছেন, তাতে জিহাদের অধ্যায় পুরোটাই শামিল করেছেন।

এর দ্বারা স্পষ্ট উদ্দেশ্য এটাই যে , তাদের কাজও একটি জিহাদ। এ বিষয়ে মাওলানা ওমর পালনপুরী রহঃ এর সাথে অধমের আলোচনা ও চিঠি আদান প্রদান হয়েছে।

হযরতের মনোভাব এমন ছিল যে, আমাদের তাবলীগী কাজও জিহাদ।

তিনি এক চিঠিতে দলিল হিসাবে এ কথা আমাকে লিখেছেন যে, তিরমিযি শরীফের একটি রেওয়ায়েতে তাবেঈ উবায়াহ্ রহঃ মসজিদে যাওয়াকে **في سبيل الله** (ফি সাবিলিল্লাহ) এর প্রয়োগ ক্ষেত্রে সাব্যস্ত করেছেন। তাহলে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে কেন তা প্রয়োগ করা যাবে না? আমি উত্তরে লিখেছি যে—

প্রথমতঃ

উবায়াহ্ রহঃ কোন সাহাবী নন। হানাফী আলেমদের নিকট সাহাবীদের কথা **حجت** বা দলিল। কিন্তু তাবেঈদের ব্যাপারে স্বয়ং ইমাম আবু হানীফা রহঃ এর কথা হল **هم رجال ونحن رجال** —তারাও মানুষ আমরাও মানুষ।

অর্থাৎ তাঁদের কথা আমাদের হানফী আলেমদের নিকট **حجت** বা স্বতন্ত্র দলিল নয়। যদি কোন সাহাবী এই পরিভাষাটি "আম" (ব্যাপক) করতেন তাহলে একটা কথা ছিল।

দ্বিতীয়তঃ

একমাত্র দাওয়াত ও তাবলীগই কেন এর প্রয়োগ ক্ষেত্র হবে? যদিও কোন কোন ভাইকে বলতে শুনা যায়—তাবলীগই দ্বীনি কাজ। হযরত রহঃ এমন বলতেন না।

যদিও তিনি বলতেন তাবলীগও দ্বীনি কাজ। কিন্তু তাবলীগ জামাতের ভায়েরা "ও" কে "ই" দ্বারা পাল্টে দিয়েছেন।

মোটকথা, তারা নিজেদের কাজকেই জিহাদ বলেন। বরং তারা হয়তো হাকীকী জিহাদকেও জিহাদ মনে করেন না। তাঁদের মতে জিহাদের ফজিলতগুলোও দাওয়াত ও তাবলীগের মাঝে সীমাবদ্ধ।

তৃতীয়তঃ

অন্য সকল দ্বীনি কাজ সম্পাদনকারীরা যেমন দ্বীনি শিক্ষাদান ও লেখালেখীতে ব্যস্ত আলেমরা নিজেদের কাজের জন্য **في سبيل الله** (ফি সাবিলিল্লাহ) ও জিহাদের ফজিলত সাব্যস্ত করেন না। এরপরেও কেন তাবলীগের ভাইরা এসকল হাদীসগুলোকে তাদের কাজের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন?

এই চিঠির পর মাওলানা ওমর পালনপুরী সাহেবের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে আর কোন চিঠি আসেনি। কোন এক চিঠিতে শ্রদ্ধেয় মাওলানা সাহেব একটি যুক্তি পেশ করেছিলেন যে, জিহাদ হল **حسن لغيره** অর্থাৎ সত্ত্বাগতভাবে ভালো নয় অন্য কারণে ভালো।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে জিহাদ হল জমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করা। আর দাওয়াত তাবলীগ স্বয়ং **حسن لذاته**(সত্ত্বাগত ভালো) এটা হল আল্লাহ তা'আলা ও সৎকাজের প্রতি দাওয়াত। সুতরাং যে সব ফজিলত ও সওয়াব **حسن لغيره** এর জন্যে তা **حسن لذاته** এর জন্যে কেন হবে না?

আমি উত্তরে আরজ করলাম এভাবে ক্বিয়াস (যুক্তি) দ্বারা সওয়াব সাব্যস্ত করা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা ক্বিয়াসটা শরঈ আহকামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সওয়াব বা ফাজায়েল এবং এ জাতীয় অন্যান্য **توقيفي** বিষয়ে ক্বিয়াস চলে না।

(তাওক্বীফী বলা হয় এমন বিষয়কে যার বাস্তবতা বান্দার বিবেক দ্বারা নিরূপণ করা যায় না। যেমন কোন সূরা পাঠে কি সওয়াব, কোন আমলে কি সওয়াব ও কোন আমলে কত গুনাহ এক্ষেত্রে আকল ব্যবহার করে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছার অধিকার শরীয়ত কাউকে দেয়নি। বরং কুরআন ও হাদীসে যতটুকু বলা হয়েছে তা সেভাবেই বহাল রাখতে হবে)

অর্থাৎ এসকম স্পষ্ট বিষয়ে কুরআন হাদীসের প্রমান আবশ্যক। তাছাড়া সওয়াবের কম বেশী কষ্টের অনুপাতে হয়ে থাকে। (যেমন হাদীসে দূর থেকে মসজিদে আগমনকারীর সওয়াবের কথা বলা হয়েছে) আর আল্লাহই ভালো জানেন, কোন কাজে কি পরিমাণ কষ্ট ও এর সওয়াব কি হবে। দুনিয়ার মানুষ এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না।

স্পষ্ট কথা হল, কষ্টের বিবেচনায় পারিভাষিক **جهاد في سبيل الله** (জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ) এর ধারে কাছেও তাবলীগী কাজ পৌছাতে পারবে না।

এরপরও কিভাবে জিহাদের সওয়াব ও ফজিলত ঐ কাজের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে। আজ পর্যন্ত মুহাক্কিক আলেমদের কেউই এ সকল বর্ণনাকে অন্য কোন দ্বীনি কাজে ব্যবহার করেন নি।

ফায়দাঃ

উপরোক্ত আলোচনায় “ও” এবং “ই” এর কথা হয়েছে (“তাবলীগও দ্বীনি কাজ”/ “তাবলীগই দ্বীনি কাজ”)। এটা একটা উদাহরণ দ্বারা ভালোভাবে বোঝা যায়। হিন্দুস্তানের একটি বড় হীরক খন্ড, কোহিনুর। এটা অত্যন্ত মূল্যবান হীরা। যদি তা হাত থেকে পড়ে ছোট বড় পাঁচ টুকরা হয়ে যায় তাহলেও এ টুকরাগুলো মুল্যহীন হবে না। প্রতিটি টুকরার কিছু না কিছু মূল্য থাকবেই।

কিন্তু কোন টুকরার এ অধিকার নেই যে সে বলবে, “আমিই ঐ কোহিনুর”। হ্যাঁ, প্রতিটি টুকরা এই কথা বলতে পারবে যে, “আমিও কোহিনুর” মানে কোহিনুরের একটি অংশ।

উক্ত উদাহরণ দ্বারা একথা স্পষ্ট হয় যে, নবী সাঃ এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযিঃ এর সকল কাজ একটি পূর্ণ কোহিনুর ছিল। তাঁরা একই সাথে দাঈ, মুবাল্লিগ, মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফকিহ, মুজাহিদ ছিলেন এবং তাঁরা রাজ্যও চালাতেন।

কিন্তু পরবর্তীতে এই সব কাজ পৃথক পৃথক হয়ে গেছে। সুতরাং যে কোন দ্বীনি কাজকারীরা এ কথা বলতে পারেন যে, আমিও সাহাবী ওয়ালা কাজ করি। কিন্তু কারোরই একথ আবলার অধিকার নেই যে, সে বলবে, আমিই একমাত্র সাহাবী ওয়ালা কাজ করি।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এ বিষয়টি বোঝার তাউফীক দান করুন এবং যে সব ভুল-ত্রুটি হচ্ছে তার সংশোধন করুন। আমীন।

-সূত্রঃ তোহফাতুল আলমায়ী

post copy করে দেওয়া হয়েছে

copy linke

https://banglaaqis.wordpress.com/২০১...৭%৮০%e০%a৬%৯৭/

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১০১২৭

জিহাদ ছেড়ে অন্য কাজে মশগুল হওয়া

Hazi Shariyatullah
Senior Member

০৭-২১-২০১৫

জিহাদ ছেড়ে অন্য কাজে মশগুল হওয়া

-মাওলানা আসেম ওমর

বর্তমান যুগে কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদের ঝাণ্ডাকে বুলন্দ করা ঠিক তেমনি ফরজ, যেমন নামাজ ফরজ। প্রত্যেককেই এই যুদ্ধে শরীক হতে হবে। চাই নিজে জিহাদে যাক অথবা মাল দিয়ে মুজাহিদদেরকে সহযোগিতা করুক অথবা মানুষকে তাদের সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত করুক। যে ঘরে বসে থাকবে সে আল্লাহর নিকট কঠিন গুনাহগার হবে। এই ধরনের মানুষকে উম্মাহর আগামী প্রজন্মও ক্ষমা করবে না।

জিহাদ ছেড়ে অন্য কাজে মশগুল হওয়াঃ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, আমি রহমতে রাসূল,আমি তুমূল লড়াইয়ের নবী। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা আমাকে জিহাদ দিয়ে পাঠিয়েছেন, ক্ষেত-খামার দিয়ে পাঠাননি। (আল হুকমূল জাদীরাতু বিন আযাআহ,ইবনে রজব হাম্বলী)

আর ইমাম বাগাভী রহঃ তাঁর মুজাম গ্রন্থে বর্ননা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা আমাকে হেদায়াত ও দিনে হক দিয়ে পাঠিয়েছেন। আমাকে ক্ষেত-খামার দিয়েও পাঠাননি। আবার ব্যাবসায়ী কিংবা বাজারে আওয়াজদাতা হিসেবে পাঠাননি। আর আমার রিজিক রাখা হয়েছে আমার বর্শার ছায়াতলে।

ইবনে রজব হাম্বলী রহঃ বলেন, এজন্য আল্লাহ তায়ালা সেসব লোককে তিরস্কার করেছেন,যারা জিহাদ ছেড়ে দিয়েছে এবং দৌলত উপার্জনে লিপ্ত হয়ে গেছে। তাদের ব্যাপারে কোরআনে এই আয়াত নাজিল হয়েছে, “তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ো না”। (সূরা বাকারা-১৯৫)

এই আয়াত তাদের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে যারা প্রথমে জিহাদে ছিল এবং পরবর্তীতে যখন একটু সময় পেয়েছে তখন বলল, নিজেদের ক্ষেত-খামারেরও কিছু দেখভাল করে নেই। এ ব্যাপারে সতর্কতা এলো যে, জিহাদ ছেড়ে দেয়া তোমাদের ধ্বংসের কারণ। (আল হুকমূল জাদীরাতু বিন আযাআহ,ইবনে রজব হাম্বলী)

হাদিস শরীফে বর্নিত হয়েছে, যখন তোমরা 'ই'নাহ' নামক (এক প্রকার সুদী ব্যাবসা) ব্যাবসায় লিপ্ত হবে,গাভীর লেজ ধরবে, জিহাদ ছেড়ে দিবে, তখন আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর এমন এক লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন, যা তোমরা আল্লাহ তায়ালা ততদিন পর্যন্ত দুর করবেন না, যতদিন তোমরা তোমাদের দ্বীনে তথা জিহাদে ফিরে না আসবে। (আবু দাউদ,হাদিসটি সহীহ)

ফায়দাঃ-

এর উদ্দেশ্য হলো, যখন তোমরা হারাম ব্যাবসায় লিপ্ত হবে, জিহাদ ছেড়ে ক্ষেত-খামারে ব্যাস্ত হয়ে যাবে, তখন জিহাদ ছাড়ার কারণে কাফেররা তোমাদের উপর বিজয়ী হয়ে যাবে এবং তোমাদের উপর লাঞ্ছনা চেপে বসবে। আর এই লাঞ্ছনা ততদিন পর্যন্ত শেষ হবে না যতদিন পর্যন্ত পুনরায় জিহাদে ফিরে না আসবে।

প্রত্যেক যুগেই এমনটি দেখা যায় যে, কাফেররা মুসলমানদের উপর নির্যাতন করছে। কিন্তু যখনই মুসলমানরা জিহাদের ঝাণ্ডা উঁচু করে, তখনই আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানীতে কাফেরদের মধ্যে ভীতি সঞ্চার হয়। ফলে যে কাফেররা কাল পর্যন্ত পোকা-মাকরের মতো পিশে মারতো, নিজেদেরকে খোদা মনে করতো, জিহাদের বরকতে আল্লাহ তায়ালা তাদের অহংকারকে মাটিতে মিশয়ে দেন। অপদস্ত ও লাঞ্ছিত হয়ে নিজেদের শক্তির জানাযা উঠিয়ে নিয়ে যায়।

মাকহুল রহঃ বলেন, (উমর রাযিঃ এর যুগে)মুসলমান যখন শামে আসেন, তখন কিছু লোক তাদের সাথে 'আল হাওলা' চাষের ব্যাপারে আলোচনা করলো। সুতরাং তাঁরা তা চাষ করলো। এই সংবাদ যখন ওমর রাঃ এর নিকট পৌঁছলো, তখন তিনি একজন দূত পাঠালেন। দূত যখন শামে পৌঁছলো, তখন ফসল পেকে গিয়েছিল। সেই দূত এসে সব ফসলে আগুন লাগিয়ে দিলেন। ওমর রাঃ তাদের কাছে লিখে পাঠিয়েছিলেন, আল্লাহ তায়ালা এই উম্মতের রিযিক বর্শার হুক এবং তাঁর নিচের অংশে রেখেছেন। (আল হুকমূল জাদীরাতু বিন আযাআহ,ইবনে রজব

হাম্বলী)

ইমাম বায়যাবী রহঃ নিজের সনদে বর্ননা করেন, ওমর রাঃ লিখে পাঠান- যে ক্ষেত-খামার করলো,গাভীর লেজের পিছনে ছুটলো,তা নিয়ে সে সন্তুষ্ট থাকলো এবং তাকেই পেহসা হিসেবে গ্রহন করলো, আমি তাঁর উপর কর ফিরিয়ে আনবো। (আল হুকমূল জাদীরাতু বিন আযাআহ,ইবনে রজব হাম্বলী)

কোন একজনকে জিজ্ঞেস করা হলো,আপনি আপনার সন্তানদের জন্যে চাষাবাদ করছেন না কেনো? তিনি উত্তরে বললেন, আল্লাহর কসম! আমরা কৃষাণ হয়ে দুনিয়াতে আসিনি। বরং আমরা এসেছি জিহাদের মাধ্যমে কাফের কৃষকদের হত্যা করে তাদের চাষাবাদ থেকে খাওয়ার জন্য।(আল হুকমূল জাদীরাতু বিন আযাআহ,ইবনে রজব হাম্বলী)

হাফেজ ইবনে রজব হাম্বলী রহঃ এসব হাদীস এবং বানী বর্ননা করার পর বলেন, মুমিনের পূর্ন আস্থা হলো, তাঁর সকল ব্যাস্ততাই হবে আল্লাহর আনুগত্য এবং জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর জন্য। যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যে মশগুল হয়ে যাবে, তাঁর রিজিকের জিম্মাদারী আল্লাহ তায়ালা নিয়ে নেন। যেমন হাদীসে বর্নিত হয়েছে, যে ব্যক্তি দুনিয়ার ফিকিরকে নিজের চিন্তা চেতনা বানিয়ে নেয়,আল্লাহ তায়ালা তাঁর সকল কাজ গড়বড় করে দিবেন এবং দারিদ্রকে তাঁর চোখের সামনে এনে দিবেন। আর দুনিয়াতো তাঁর ততটুকুই মিলবে, যতটুকু লিখা হয়েছে। আর যার নিয়ত আখেরাত হবে, তাঁর সবকিছুই সহজ করে দিবেন। আর অন্তরে ধনাঢ্যতা সৃষ্টি করে দিবেন। দুনিয়া নিজেই তাঁর নিকট চলে আসবে। (মুসনাদে আহমদ ও ইবনে মাজাহ)

এসব হাদীসের উদ্দেশ্য হলো মুজাহিদদের জন্যে জিহাদ ছেড়ে ক্ষেত-খামার এবং ব্যাবসা বানিজ্যে মশগুল হওয়া উচিত নয়। কারণ, এতে জিহাদ কমজোর হয়ে যাবে। বকি থাকে রিজিকের প্রশ্ন। আল্লাহ তায়ালা এই জিহাদের মাধ্যমেই মুজাহিদদের পবিত্র ও হালাল রিজিকের ব্যাবস্থা করবেন। তেমনিভাবে সাধারণ মুসলমানদেরও ক্ষেত-খামার এবিং ব্যাবসা-বানিজ্যে মশগুল হয়ে জিহাদ থেকে দুরে থাকা উচিত নয়। কারণ জিহাদ ছেড়ে দিলে সকল মুসলমানদের ক্ষতি হবে। যেমনটি বর্তমানের অবস্থা। মুসলমানদের সকল আসবাবপত্রের উপর ইহুদী এবং হিন্দুদের দখলদারিত্ব। সকল মুসলিম রাষ্টে জনগনকে সুদী লেনদেনে ডুবিয়ে

রেখেছে। মুসলমান দুনিয়ার পিছনে ছুটছে। কিন্তু দুনিয়া হাতে আসছে না। আগত প্রতিটি দিনব্যাবসা-বানিজ্য এবং চাষাবাদের নতুন নতুন পয়গাম নিয়ে আসছে। এই ধারাবাহিকতা ততদিন পর্যন্ত চলবে যতদিন পর্যন্ত নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য আমেরিকা এবং বিশ্ব সংস্থাগুলোর সাথে জিহাদ না করবে। তাঁরা নিজেদের কথা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মানতে বাধ্য করে।

সুতরাং আমাদেরকেও জিহাদের শক্তি প্রয়োগের মধ্যমে নিজেদের দ্বীন, আসবাবপত্র এবং ইজ্জতের প্রতিরক্ষা করতে হবে। আমরা জিহাদ করলে হিন্দু এবং ইহুদীদের সোনা-দানা এবং হীরা-জহরতে সজ্জিত মহলগুলো আমাদের কদমে ঢেলে দিবে। তারপর আর কোন রুই কাতলা আমাদের আসবাবপত্রগুলো লুটে পালাতে পারবে না। কোন জর্জ সোরিসও হবে না, যে নিজের পয়সা বের করে নিয়ে যাবে এবং দু'দিনের মধ্যে মুসলিম দেশগুলর অবস্থা ওলট-পালট করে দিবে।

আপনি সে অবস্থার কথা চিন্তা করুন; যখন বিশ্ব ব্যাংকার 'রক ফেলার্জ','রুথ শিলার্ড'ও জি পি মরগানের মতো ইহুদীদের সমস্ত সম্পদ মুজাহিদদের মালে গণীমত হবে। গোটা পৃথিবীর সোনা-দানা; যেগুলো এই সুদখোররা নিজেদের দখলে রেখেছে, সেগুলো সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। পক্ষান্তরে জিহাদ ছেড়ে দিলে এমনি হতে থাকবে যে, সর্বোত্তম উম্মতের বাচ্চাদের মুখ থেকে লোকমা কেড়ে নিয়ে সুদখোরদের সুদ আদায় করতে থাকবে এবং সুদ আদায় করতে করতেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিবে। ব্যাবসায়ী তাঁর মেহনতের উপার্জন তাদেরকে দেয়, কৃষক রক্ত ঘাম ঝরায় কিন্তু নিজের বাচ্চাদের পেটও ভরাতে পারে না।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৩৪১

গোয়ান্তানামোর বন্দী সাথীদের কিছু স্বপ্ন

abudujanah

Senior Member

০৭-১৬-২০১৮

আব্দুর রহীম মুসলিম দোসত। আফগান মুজাহিদ। গোয়ান্তানামো কারাগারে বন্দী ছিলেন প্রায় সাড়ে তিন বছর। মুক্তি পেয়ে কারা জীবন নিয়ে লিখেছেন চমৎকার এক বই।

গোয়ান্তানামো কি টুটি যিনজীরে-নামে যার উর্দূ অনুবাদ বের হয়েছে। পশতু ভাষায় লেখা মূল বইটি বিক্রি হয় আড়াই লাখ কপি। আর উর্দু অনুবাদটি বিক্রি হয় বিশ হাজার কপি।

বইটিতে লেখক গোয়ান্তানামোর বন্দী সাথীদের বেশ কিছু চমকপ্রদ স্বপ্ন উল্লেখ করেছেন।
স্বপ্নগুলো তাঁদের জন্য এবং আমাদের সবার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বুশরা-সুসংবাদ।
লেখকের ভাষায়ই স্বপ্ন গুলো উল্লেখ করছি।

০১ - তুমি হকের উপর আছো

স্বপ্নটি দেখেছেন এক আরব মুজাহিদ। তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঠিক সেই অবয়বে দেখেছি যা হাদিসে উল্লেখ রয়েছে। আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমাদের উপর কাফেরদের জুলুম নির্যাতনের কথা বললাম। শুনে তিনি বললেন, এটা নিয়ে তুমি দুঃচিন্তা করো না। কারণ, তুমি হকের উপর আছো। ওরা শীঘ্রই ধ্বংস হয়ে যাবে।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে তখন সাদা দুটি পাথর ছিল। তার একটি এই মাত্র কাফেরদের উপর নিক্ষেপ করেছেন। আরেকটি তাঁর হাতেই আছে।
আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, ওদের উপর আমি প্রথম হামলাটি করেছি। এতেও

তারা যদি সঠিক পথে না আসে তাহলে শীঘ্রই দ্বিতীয় হামলাটিও করবো। তখন তারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাবে।

ভিতরেরই এক মুজাহিদ ভাই স্বপ্নটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, ৯/১১ এর হামলার মাধ্যমে কুফরের সরদার আমেরিকার অর্থনৈতিক অবস্থা অর্ধেক ভেঙে পড়েছে। বাকিটুকু ইনশাআল্লাহ ইমাম মাহদি এবং হযরত ঈসা আ.র সময় হবে।

০২ - তোমরা সবাই কামিয়াব

এ স্বপ্নটিও দেখেছেন এক আরব মুজাহিদ।

তিনি বলেন আমি দেখেছি, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কান্দাহারে অবস্থিত আরব মুজাহিদদের কবরস্থানের পাশে একটি বড় পাথরের উপর দাঁড়িয়ে আছেন এবং শহীদদের জন্য দোয়া করছেন।

সেই কবরস্থানে আমার পরিচিত এক ভাইও ছিল। দেখি যে, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলছেন, আমেরিকা এবং আফগানি কিছু মুনাফিক আমাদের উপর চরম জুলুম করছে। এক আফগান কমান্ডারের লোকেরা ষাট জন মুজাহিদকে যবাই করে শহীদ করেছে। তাদের মধ্যে কোন কোন মুজাহিদকে ঘাড়ের দিক দিয়ে যবাই করেছে।

তার কথা শুনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ অতি শীঘ্রই এদের সবাইকে ধ্বংস করবেন। পক্ষান্তরে তোমরা সবাই কামিয়াব।

এরপর বললেন, এখানে (আফগানিস্তানে) মুনাফিক যেমন আছে বেশ কিছু ভাল লোকও আছে। তাদের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা ইসলামকে বিজয় দান করবেন। আর মুনাফিকদেরকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করবেন।

০৩ - তোমরা হলে দ্বিতীয় বদরের মুজাহিদ

এ স্বপ্নটি দেখেছেন মিশরের এক মুজাহিদ।

তিনি বলেন দেখি যে, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দাঁড়ানো। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কী অবস্থা ? বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! বন্দীশালায় পড়ে আছি। আমাদের প্রতি চরম জুলুম করা হচ্ছে।* তিনি বললেন, নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন। আল্লাহর হুকুমে

শীঘ্রই মুক্তি পাবে। এরপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সাথে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেন। বেশ কিছু উপদেশও দেন। যার মধ্যে বেশি বেশি ইবাদত করা, দোয়া করা, বিশেষ করে নজর হেফাজত করার বিষয়টি ছিল। তিনি বললেন, নারী সৈন্যদের দিকে তাকাবে না। নজর হেফাজত করবে। তিনি আমাকে এও বলেছেন,

انتم من أهل البدر

- তোমরা হলে বদরী মুজাহিদ।

আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! বদরী মুজাহিদ তো তাঁরা যারা চৌদ্দশ বছর পূর্বে অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তখন বললেন,

انتم من أهل البدر الثاني

- তোমরা হলে দ্বিতীয় বদরের মুজাহিদ।

০৪ - সে তোমাদের আমীর

এক ভাই বলেছেন, আমি দেখেছি, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে দাঁড়ানো। তাঁর সঙ্গে আরো একজন লোক দাঁড়ানো। যার চেহারাসহ পুরো শরীর কাপড় দিয়ে ঢাকা। সেই লোকটির দিকে ইশারা করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বললেন, সে তোমাদের আমীর।

ভিতরের এক মুজাহিদ ভাই এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তিনি হলেন হযরত ইমাম মাহদি। যিনি বর্তমানে আমাদের মাঝেই আছেন। তবে আমরা তাঁকে চিনতে পারছি না।

০৫ - আমি শীঘ্রই আসছি

স্বপ্নটি দেখেছেন এক আরব মুজাহিদ। তিনি বলেন, তখন মৌসুম ছিল প্রচণ্ড শীতের। আমি তখন আরো অনেকের সঙ্গে আফগানিস্তানের বাগরাম কারাগারে বন্দী। দেখি যে, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর ডান হাতে কুরআনুল কারীম এবং বাম হাতে ইনজীল। লোকজন আমাকে বলল, ইনি হলেন হযরত ঈসা আ.। আমি তার সঙ্গে কোলাকুলি করতে এবং তাঁর কপালে চুমু খেতে তাঁর দিকে ছুটে গেলাম।

কিন্তু তিনি আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। এটা দেখে ওখানে উপস্থিত কয়েকজন লোক তাঁকে লক্ষ্য করে বলল, ইনি আরব মুজাহিদ।

*বর্তমানে বাগরাম কারাগারে মার্কিনীদের হাতে বন্দি। শীঘ্রই তাকে গোয়ান্তানামোতে পাঠিয়ে দেয়া হবে।

একথা শুনেই তিনি আমার দিকে এগিয়ে এলেন। তার দু'হাত ছড়ানো ছিল। ডানহাতে কোরআনুল কারীম আর বাম হাতে ইনজীল। কাছে এসে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং আমার কপালে চুমু খেলেন।

এরপর বললেন, তুমি কামিয়াব। দুঃচিন্তা করো না। আল্লাহ তাআলা খুব দ্রুতই তোমাকে মুক্তি দেবেন। আমি শীঘ্রই আসছি। এসব লোক যারা নিজেদেরকে ঈসায়ী বলে দাবি করে তাদের কিছু লোককে আল্লাহ তায়ালা হেদায়েত দেবেন আর অবশিষ্টদেরকে ধ্বংস করবেন। আমি এসে আল্লাহর যমিনে 'মুহাম্মদী শরীয়ত' প্রতিষ্ঠা করবো।

কথা শেষ করে তিনি আমার ডান হাত শক্তভাবে ধরলেন এবং তাতে সামান্য লালা লাগিয়ে দিলেন। হাতে লালা লাগার সাথে সাথে আমার চোখ খুলে যায়। ঘুম ভাঙার পর আমি আমার হাতে সেই লালা দেখতে পাই। যা থেকে সুগন্ধি বের হচ্ছিল। আমার কাছে তখন খুব ভালো লাগছিল। মনে খুব প্রশান্তি লাগছিল। আমার সঙ্গীরা তখন আমাকে সুগন্ধির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। ব্লকে তখন কথা বলার অনুমতি ছিল না। কিন্তু আমি নিম্নস্বরে এক দু'জনের কাছে পুরো স্বপ্নটি বলি। এরপর স্বপ্নটির কথা ধীরে ধীরে সবার মাঝে ছড়িয়ে যায়। তখন সবাই আমার কাছে এসে সেই সুঘ্রান নিতে আরম্ভ করে। মার্কিন কারারক্ষীরা দেখতে পেয়ে এর জন্য আমাদের সবাইকে শাস্তি দেয়। ওরা স্বপ্নটির কথা জানতে পেরে আমাকে তা আর কারো কাছে বলতে নিষেধ করে। এরপর থেকে তারা জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় মুজাহিদদেরকে স্বপ্নের ব্যাপারেও জিজ্ঞেস করতো।

০৬ - তিনি হলেন হযরত উমর রাযি.

এক ভাই বলেছেন, আমি দেখেছি যে, সমুদ্রের ঢেউ আমাদের ব্লকগুলোর ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। ব্লকগুলোর অর্ধেকটা পানিতে ভরে যাচ্ছে। ঢেউ যখন ফিরে যাচ্ছে তখন ব্লকের একটা পাশ ভেঙে পড়ছে এবং পানি পূর্বের জায়গা পর্যন্ত চলে যাচ্ছে।

তখন সবাই বের হয়ে সমুদ্রের দিকে ছুটতে শুরু করে। তখন সেখানে একটি জাহাজ দাঁড়ানো ছিল। জাহাজের দরজায় সুঠামদেহী দীর্ঘকায়*এক ব্যক্তি সাদা আরবি জুব্বা পড়ে হাতে ঢাল-তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি সবাইকে জাহাজে উঠার জন্য ইশারা দিচ্ছেন আর সবাই জাহাজে উঠছে। আমি তখন একজনকে জিজ্ঞেস করি, ইনি কে ?* উত্তর দেন, তিনি হলেন হযরত উমর রাযি.। তিনি বন্দীদেরকে মুক্ত করতে এসেছেন। আমরা যখন জাহাজে উঠছিলাম তখন মার্কিন সৈন্যরা আমাদেরকে ধাওয়া করতে শুরু করে। তারা কাদা মাটি পর্যন্ত এসে যায়। কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছিলাম, কাদামাটি তাদের পায়ের নীচ থেকে পিছন দিকে সরে যাচ্ছে।

০৭ - দোয়ায় ইউনুস আ.

এক ভাই বলেছেন, আমি দেখেছি, সবাই নিজ নিজ ব্লক থেকে বের হয়ে সমুদ্রের তীরে একত্রিত হলেন। তখন সমুদ্র থেকে এক বিশাল আকৃতির মাছ এসে সবাইকে গিলে ফেলে। কিছুক্ষণ পর দেখলাম, সমুদ্রে আগুন লেগে যায়। এতে ওই মাছটি তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করতে শুরু করে। তখন মাছটি তীরে এসে অর্ধেক বন্দীদেরকে তীরে ফেলে পুনরায় সমুদ্রে চলে যায়। কিন্তু তারপরও মাছটির অস্থিরতা কমে নি। ধীরে ধীরে মাছটি দুর্বল হয়ে যায়।

ভিতরের এক ভাই ব্যাখ্যা দিয়েছেন,

অর্ধেক সাথী দ্রুতই*মুক্তি লাভ করবে। বাকিদের মুক্তি পেতে একটু দেরি হবে। বাস্তবেও তাই হয়েছিল। এগারশ সাথীর মধ্যে কিছুদিন পরই পাঁচশর উপরে সাথী মুক্তি লাভ করেছিলেন। বাকিরাও পরবর্তীতে মুক্তি লাভ করেছেন। ব্যাখ্যা শেষে ওই ভাই উপস্থিত সবাইকে হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের দোয়াটি বেশি বেশি পড়তে বলেন।

দোয়ায় ইউনুস আ.

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ - سورة الأنبياء : ٨٧

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১০১৯৩

সংগঠনে যুক্ত সম্মানিত ভাইদের প্রতি - আপন হৃদয় কুটিরে জমে থাকা রসকসহীন কিছু কথা.....

সংগ্রামী যুবক

Member

০৮-০৩-২০১৮

শুরুতেই জেনে রাখা ভালো উক্ত লিখাটিতে আমি আম মুসলিমদের নয় বরং জিহাদী জামাতে যুক্ত বা জিহাদের ব্যাপারে পাকাপোক্ত এমন ভাইদেরকে ফোকাস করেছি। আর আমি মনে করি এর বিষয়বস্তুর ফরজিয়াত/ফযিলত কিংবা গুরুত্বর বিষয়ে সম্মানিত ভাইয়েরাই অধিক জ্ঞানী। আর তাই আমি উক্ত লিখাটির মূল বিষয়বস্তুর প্রেক্ষিতে কুরআন-হাদিসের তেমন কোন দলিল/আদিল্লা কোড করিনি বরং বাস্তবতার নিরিখে আপন হৃদয় কুটিরে জমে থাকা কিছু আকুতি পেশ করেছি মাত্র। তাই একটু বড় মনে হলেও সকল ভাইদেরকে ধৈর্যের সাথে পুরোটা পড়ার জন্য বিনয়ের সহিত অনুরোধ করছি।

রাহমান ও রাহিম অদ্বিতীয় আল্লাহ্*র নামে

ইন্নাল হামদালিল্লাহ , ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রসুলিল্লাহ

পটভূমি :

দুনিয়ার এই ক্রান্তিলগ্নে বিশ্বায়নের মূর্তিরূপে নব্য আইয়ামে জাহিলিয়াতে ধরার বুকে বিশেষ করে আমাদের এ উপমহাদেশে এমন কোন ব্যক্তি বা যুবক-যুবতী কিংবা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা পাওয়া হয়তো আমাবস্যার চাঁদ হয়ে দাঁড়াবে , যাদের কর্ণকুহরে ঝিঁঝিঁ পোকা তথা ক্রিকেট নামক হারাম খেল-তামাশার চার-ছক্কা আর উইকেট ভাঙ্গার বিশৃঙ্খল ও চেতনাহীন ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়নি বা হচ্ছেনা। হারাম-বেহায়াপনা আর অশ্লীলতায় আচ্ছাদিত এই ক্রীড়াতে প্রতিটি দেশের খলনায়ক নামক খেলোয়াড়দের পারফর্ম করার কয়েকটি ডিপার্টমেন্ট থাকে , যার ব্যাপারে আমরা প্রায় সবাই শামস-উল-উলামা [জ্ঞানীদের মধ্যে সূর্য]। ব্যাটিং , বোলিং এবং ফিল্ডিং হল যার মৌলিক বিভাগ । প্রত্যেককেই অন্তত একটি বিভাগে খুব দক্ষ হয়ে উঠতে হয় দলে টিকে থাকার জন্য। আর যে এই সকল বিভাগেই খুব দক্ষ থাকে তাকে বলা হয় অলরাউন্ডার। আর যখন সে উল্লেখিত এই সর্ব

ডিপার্টমেন্টেই অসাধারণ পারফর্ম করে থাকে, তখন তাকে অধিষ্ঠিত করা হয় মহানায়কের আসনে কিংবা গলায় শোভা পায় দুনিয়ার তুচ্ছ সম্মান-যশ-খ্যাতির মহামাল্য। দক্ষ এই পারফর্মার অলরাউন্ডার এর কি পরিমাণ কদর ও সম্মান তা আমরা দেখতে পাই গো-মুত্র পানকারী নাপাক মালাউন্দের দেশের নিকৃষ্ট আর অভিশপ্ত আইপিএল নামক বিশ্বের বৃহৎ জুয়ার আসরে। যেখানে একজন দক্ষ অলরাউন্ডারের মূল্য থাকে দুনিয়ার তুলনায় আকাশচুম্বী। আর যখন সে পূর্বপাতানো অভিশপ্ত এ জুয়ার আসর তথা আইপিএল মাঠে দেখাতে পারে অসাধারণ কোন পারফর্মেন্স তখন তার আর কিছুর অভাব হোক বা নাহোক দিল্লির আর মুম্বাইয়ের সস্তা পতিতাদের ন্যায় নারী আর ফ্যানের অভাব হয় না, যদিও ক্ষণস্থায়ী মূল্যহীন টাকা-যশ-খ্যাতি-সম্মান লাভ তো আছেই। এই হল দুনিয়ার নাপাক ক্রীড়া-কৌতুকের এক তুচ্ছ অলরাউন্ডারের মর্যাদা বা মূল্য, যার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় সে দেহ-মন উজাড় করে দেয় মাঠে-ময়দানে কোন কিছুর পরোয়া না করে। হ্যাঁ কোন কিছুর পরোয়া না করেই। দেখুন বর্তমান বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম অধিনায়ক মাশরাফির পায়ে ১১ বার অস্ত্রপচার হওয়া সত্ত্বেও সে দিব্যি খেলে যাচ্ছে, অথচ ডাক্তারগণ বলে থাকেন কারো পায়ে ২/৩ বার অস্ত্রপচার হলেই তার পক্ষে খেলা চালিয়ে যাওয়া খুব ঝুঁকিপূর্ণ। তাই তাকে অবসরে যাওয়া উচিৎ। অথচ ১১ বার হওয়া সত্ত্বেও সে খুব উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথেই খেলে যাচ্ছে সকল বিপদ-ঝুঁকি উপেক্ষা করে। কিসের টানে? সেই ক্ষণস্থায়ী মূল্যহীন টাকা-যশ-খ্যাতি-সম্মান লাভ আর অভিশপ্ত দেশ বা জাতীয়তাবাদের টানে। **তাহলে আল্লাহ দয়া করে যাঁদেরকে দ্বীন আল ইসলাম বা ইসলামের হাকিকত কিতাল ফি সাবিলিল্লাহর বুঝ দিয়েছে, তাঁদের এ পথে কি পরিমাণ কুরবানি ও আত্মত্যাগ আবশ্যক তা আবার নতুন করে মুসাহাবা করা উচিৎ । সেই সাথে এটাও চিন্তা-ভাবনা করা আবশ্যক যে , এ পথের জরুরত বা দাবী অনুযায়ী আত্মত্যাগ বা কুরবানি কি আমরা সাধ্যমতো করতে পারছি বা করছি !!**

অতঃপর সম্মানিত ভাই আমার, আপনার প্রতি...

আপন হৃদয় কুটিরে জমে থাকা রসকসহীন কিছু কথা.....

আজ জিহাদী ক্রীড়ার ময়দানে দক্ষ অলরাউন্ডারের বড়ই অভাব , যে সকল প্রকার ঝুঁকি কিংবা বাঁধা-বিপত্তি পিছু ফেলে দেহ-মন উজাড় করে সকল বিভাগেই অসাধারণ পারফর্ম করবে। আজ আমাদের এ মাঠে তেমন অলরাউন্ডারের বড়ই আবশ্যক যেমন অলরাউন্ডার ছিলেন আমাদের আদর্শ ও গৌরবদীপ্ত পূর্বপুরুষ মাদিনার সম্মানিত আনসারগণ। দ্বীন আল ইসলামের কেমন অলরাউন্ডার তাঁরা ছিলেন তা আমার থেকে আপনারাই ভালো অবহিত। তাঁরা একদিকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসসালাম ও তাঁর সহায়-সম্বল ও আশ্রয়হীন সাহাবীদের আশ্রয় তথা সেফ হাউস প্রদান করে হলেন দ্বীনের আনসার। অপরদিকে শুধু আশ্রয় দিয়েই বসে না থেকে বরং তাঁদের তরে অকাতরে নিজেদের সমুদয় অর্থ-সম্পদ ঢেলে দিয়ে হলেন দ্বীনের ডোনার। আর সকল আনসার সাহাবীই যখন সম্বলহীন মুহাজিরদের সাথে নিজেদের সমুদয় অর্থ-সম্পদ ও ঘর-বাড়ি ভাগ-বাটোয়ারা করে নিলেন, তখন সাদ ইবনুর রাবি রাদিআল্লাহু আনহু ইসলামের তরে আলরাউন্ডারের এমন অনন্য এক দৃষ্টান্ত স্থপন করেন যা গোটা মানব ইতিহাসে বিরল।

“ আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত – আব্দুর রাহমান ইবনে আউফ হিজরত করে মাদিনায় এলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদ ইবনে রাবির সাথে তাঁর ভ্রাতৃসম্পর্ক কায়েম করে দেন। সাদ ছিলেন মাদিনার খাজরাজ গোত্রের নেতা ও ধনাঢ্য ব্যক্তি। তিনি আব্দুর রাহমান ইবনে আউফকে বললেন – আনসারদের সকলে জানে আমি একজন ধনী ব্যক্তি। আমি আমার সকল সম্পদ [আপনার সাথে] সমান দুভাগে ভাগ করে দিতে চাই। আমার দুজন স্ত্রী আছে। আমি চাই আপনি তাদের দুজনকে দেখে একজনকে পছন্দ করুন । আমি তাকে তালাক দিব । তারপর আপনি তাকে বিয়ে করে নিবেন। ” [আসহাবে রাসুলদের জীবনকথা – প্রথম খণ্ড – পৃষ্ঠা – ৭২] আল্লাহু আকবর ! আমার ভাই , একটু থমকে দাঁড়ান। আর একটু মন খুলে চিন্তা করুন আত্মত্যাগের এই বিরল দৃষ্টান্ত নিয়ে।

অতঃপর জান বা রক্ত, সময় কিংবা শ্রম দেওয়ার ডিপার্টমেন্টেও ছিলেন তাঁরা অগ্রগণ্য। সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্যকারী প্রথম যুদ্ধ গাযওয়ায়ে বদরে যেই ৩১৩ জন সাহাবী অংশগ্রহন করেন তার মধ্যে ২৩০ জনই হলেন আনসার। এবং উক্ত যুদ্ধে শহীদ হওয়া ১৪ জনের মধ্যে ৮ জনই আনসার। অতঃপর গাযওয়া উহুদে শহীদ হওয়া ৭০ জন সাহাবীর মধ্যে ৬৬ জনই হলেন আনসার সাহাবী। আবার

ভাবুন ৭০ জন শহীদের মধ্যে ৬৬ জনই আনসার সাহাবী। দ্বীন আল ইসলামের কেমন পাগল তাঁরা ছিলেন বুঝতে পারছেন! বি'রে মাউনার শহীদদের মধ্যেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছিলেন আনসার। [আসহাবে রাসুলদের জীবনকথা – খণ্ড – ৩ – পৃষ্ঠা – ১১] হুনাইনের যুদ্ধের প্রতিকূল পরিস্থিতির সময়েও যুদ্ধের মোড় ঘুড়িয়ে দেন এই আনসার অলরাউন্ডারগণই। এভাবেই ইসলামের প্রায় সকল যুদ্ধ মাঠেই আনসার বা সেফ হাউস – ডোনার কিংবা অর্থ-সম্পদ - সময় বা শ্রম – জান বা রক্ত সবকিছু দিয়েই অসাধারণ পারফর্ম করেছেন এই অলরাউন্ডারগণ। যাঁদের আত্মত্যাগ আর কুরবানির বদৌলতেই আল্লাহ্* এই দ্বীনকে বিজয়ী করেছেন।

আজ যদি আমরাও পারি আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী কিতালের অলরাউন্ডার হতে তাহলে আমাদের এই ভূখণ্ডেও ইনশাআল্লাহ্* দ্বীন আল ইসলামের পতাকা আর বেশী দিন ধুলোয় ধূসরিত থাকবেনা। আর আমাদের কাঙ্ক্ষিত তামকিনও আল্লাহ আমাদের দান করবেন অতি শিগ্রই যদি আমরা বর্তমানের কিতালের চাহিদা অনুযায়ী অলরাউন্ডার হতে পারি যাদের সেই সামর্থ্য রয়েছে। ইতিহাস সাক্ষী এই দ্বীন গালেব হওয়ার জন্য খুব বেশী ভাইয়ের প্রয়োজন হয়না ইনশাআল্লাহ্*। অল্প কিছু সামর্থ্যবান ভাইও যদি ইখলাসের সাথে নিজেদের সামর্থ্যের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ করে যায় এই দ্বীনের জন্য তাহলে তাদের বরকতেই আল্লাহ এই দ্বীনকে বিজয় দান করেন বা করবেন ইনশাআল্লাহ্*। হ্যাঁ যদি আমরা আমাদের প্রত্যেকের সামর্থ্য অনুযায়ী সর্বচ্চো আত্মত্যাগ করি। আর আমাদের প্রত্যেকের সামর্থ্যের ব্যাপারে আমরা নিজেরাই খুব ভালো ওয়াকিবহাল, এখন আমরা যতই অজুহাত পেশ করিনা কেন। আল্লাহ্* সুবহানাহু বলেন –

" বরং মানুষেরা (মূলত) নিজেদের ব্যাপারে নিজেরাই সম্যক অবগত , যদিও সে নিজের (স্বপক্ষে) বিভিন্ন অজুহাত পেশ করতে চাইবে। [আল কিয়ামাহ – ১৪-১৫] "

আর যখন জিহাদ ফরদুল আইন হয়ে যায় তখন এই উম্মাহর, বিশেষ করে উম্মাহর যুবাদের আর কোন ক্যারিয়ার থাকতে পারেনা কিতাল ব্যতিত। আর স্বীয় ক্যারিয়ারের একমাত্র গোল বা লক্ষ্য শাহাদাহ ছাড়া আর কিছুই হতে পারেনা। কারণ স্বীয় অস্তিত্তের সাথে মিশ্রিত দ্বীন আল ইসলামের পতাকা যখন থাকে

ধুলোয় ধূসরিত, তখন এই উম্মাহর থাকেনা কোন সম্মান-ইজ্জত লাঞ্ছনা ব্যতিত। যেমনটাই পুরো পৃথিবী জুড়ে আজ স্পষ্ট পরিলক্ষিত। আর এহেন অবস্থায় নিজেকে জিহাদের ফরজিয়াত থেকে এবং সামর্থ্যবানদের উদার হস্তে কিতালের পথে ব্যয় করা থেকে বিরত থাকার কোন সুযোগ বা অজুহাত থাকতে পারেনা।

আচ্ছা যদি আমি প্রশ্ন করি – সম্মানিত ভাই আপনার নিকট সবচেয়ে মূল্যবান বস্তুটির নাম কি যা নিজের সমস্ত সম্পদ, নিজ জীবন এবং পরিবারের সকলের জীবনের চাইতেও অধিক দামী? আপনার অন্তর যদি ঈমানি বলে বলিয়ান থাকে তাহলে কিন্তু আপনি খুব দিঢ়ভাবেই বলে উঠবেন দ্বীন, এরপর দ্বীন , এরপরও দ্বীন। **কেননা উইথআউট দ্বীন আমার অস্তিত্বই মূল্যহীন।**

কি ঠিক বললাম? যদি আমার সাথে আপনি একমত থাকেন তাহলে এবার আসুন একটু বাস্তবতা নিয়ে মুজাকারা করি । তার আগে আরেকবার স্মরণ করিয়ে দেই – একটু আগেই কিন্তু আপনি উপরে বলে এসেছেন যে নিজের সমস্ত সম্পদ এবং নিজ ও নিজ পরিবারের সকলের জীবন এসমস্ত কিছু থেকে দ্বীন-ই আপনার নিকট সবচেয়ে দামী।

ডক্টর আবদুল্লাহ আজ্জাম রহিমাহুল্লাহ তাঁর তাওবার তাফসীর কিতাবে অ্যামেরিকান এক ধনাঢ্য ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেন। যে ছিল প্রচুর ধন-সম্পদ এর মালিক। কোন কিছুর অভাব তার ছিল না। শুধুমাত্র তার একটি সমস্যা ছিল , তার মোটেও ঘুম হতো না। এটাই হল তার একমাত্র সমস্যা। সে এর জন্য অনেক ডক্টর দেখিয়েছে এবং অনেক টাকাও খরচ করেছে কিন্তু কোন ডক্টর-ই তার চোখে ঘুম আনতে পারলনা। অবশেষে সে বাধ্য ঘোষণা দেয় যে – **" যে ব্যক্তি আমার চোখে ঘুম এনে দিতে পারবে তাকে আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে দিবো । "** এতোটুকুই আমার প্রাসঙ্গিক কথা। তার ঘোষণাটি নিয়ে আবার ভাবুন - " **যে ব্যক্তি আমার চোখে ঘুম এনে দিতে পারবে তাকে আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে দিবো।** " খেয়াল করুন ঘুম হল মানব জীবনের জাস্ট একটি পার্ট। যেই ঘুমের নিকট তার এতো বছরের তিলে তিলে গড়ে তোলা সমস্ত সম্পত্তি আজ মূল্যহীন তুচ্ছ। স্রেফ ঘুমের নিকট সারাজীবনের সমস্ত সম্পত্তি যদি এতো মূল্যহীন হয়ে থাকে তাহলে আপনার আর আমার জীবনের নিকট আমাদের সমস্ত অর্থ-সম্পদ কতো মূল্যহীন বা তুচ্ছ তা কি বুঝতে পারছেন! আর তা যথাযথ উপলব্ধি করার জন্য চলুন

আরেকটি বাস্তব উদাহারন দেখি যা আমাদের সামান্য কদিনের এই পৃথিবীতে অহরহ ঘটে থাকে।

যখন কোন ব্যক্তির নিজের বা নিজ পরিবারের কারো এমন কোন রোগ হয় যার দরুন তার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা একদম ক্ষীণ হয়ে যায়, তখন সেই সামর্থ্যবান বা সম্পদশালী ব্যক্তি কি করে? সে কি একবারও ভাবে যে – সে তো একভাবে না একভাবে মারাই যাবে তাহলে শুধু শুধু এতো টাকা পয়সা খরচ করে লাভ কি যা আমার এতো বছরের কষ্টার্জিত অমূল্য সম্পদ! না, তা কিন্তু সে ভাবে না বা করেও না। বরং সেই রোগ থেকে আরোগ্য লাভের জন্য যদি তার সারাজীবনের সমস্ত সম্পদ-ও ব্যয় করে দিতে হয় তাও কিন্তু সে করে। আপনি বা আমিও কিন্তু হয়তো এটাই করবো। কারণ সারা জিন্দেগীর রক্ত আর ঘামের বদৌলতে তিলে তিলে গড়ে তোলা কষ্টার্জিত সমস্ত সম্পদের মূল্যও আমার নিকট আমার প্রাণের চাইতে বেশী নয়। যেই অনিশ্চিত প্রাণ টাকে স্রেফ অল্প কিছু দিনের জন্য বাঁচিয়ে রাখার নিমিত্তে মানুষ তার সমস্ত সম্পদ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত বা দেয়, যা আমাদের স্পষ্ট চক্ষুষ্মান।

তাহলে আমাদের সবচাইতে প্রিয় বা দামী আমাদের প্রাণ বা আমাদের পরিবারের কারো প্রাণ যাকে বাচিয়ে রাখার জন্য আমরা আমাদের সমস্ত অর্থ-সম্পদ বিসর্জন দিয়ে দেই, সেই প্রাণের চাইতেও আমাদের নিকট অধিক মূল্যবান বা দামী হল স্বীয় দ্বীন। কি ঠিক তো ?

তাহলে যেই অনিশ্চিত প্রাণ কে অল্প কিছুদিনের জন্য বাঁচিয়ে রাখার নিমিত্তে যেই পরিমাণ সম্পদ ব্যয় ও আত্মত্যাগ করতাম বা করি, সেই পরিমাণ সম্পদ ব্যয় বা আত্মত্যাগ কি আমরা করছি আমাদের দাবী অনুযায়ী আমাদের প্রাণের চাইতেও অধিক , আমাদের প্রাণের চাইতেও অধিক, আমাদের প্রাণের চাইতেও অধিক মূল্যবান দ্বীন আল ইসলামকে টিকিয়ে বা বাঁচিয়ে রাখার নিমিত্তে কিতাল ফি সাবিলিল্লাহতে !!! যেই দ্বীনের পতাকা আজ ধুলোয় ধূসরিত, যেই দ্বীন আজ মাজলুম। মুমূর্ষু এই দ্বীনকে পুনঃজাগরণের জন্য জ্বিহাদে তেমন সম্পদ বিসর্জন ও আত্মত্যাগ কি করছি আমরা , যেমন করতাম নিজ বা নিজ স্ত্রী-সন্তানের মুমূর্ষু প্রাণ বাঁচিয়ে তোলার জন্য ! আমি আবারো বলছি গভীর মনোযোগ দিয়ে একটু ভাবুন আমার ভাই - মুমূর্ষু এই দ্বীনকে পুনঃজাগরণের জন্য জ্বিহাদে কি আমরা তেমন

সম্পদ বিসর্জন ও আত্মত্যাগ করছি , যেমন করতাম নিজ বা নিজ স্ত্রী সন্তানের মুমূর্ষু প্রাণ বাঁচিয়ে তোলার জন্য !!!

তার মানে আমি এটা বলছিনা বা বুঝাচ্ছিও না যে আমি প্রাণ বাঁচাতে চিকিৎসা করতে নিরুৎসাহিত করছি। বরং আমি আমাদের বাস্তবতাটা বুঝাতে চেষ্টা করছি। আসলে এটাই হল আমাদের বাস্তবতা যে পরিস্থিতির স্বীকার হয়ে আমি ঠিক-ই বেহিসাবি অঢেল অর্থ ব্যয় করে থাকি, এমনকি কঠিন না নাজুক পরিস্থিতিতে নিজ জীবনের সমস্ত অর্থ-সম্পদ-ও ব্যয় করে দিতে দ্বিধা বা কুণ্ঠাবোধ করিনা। তাহলে মুসলিম উম্মাহ কি আজ এক কঠিন থেকে কঠিনতর নাজুক পরিস্থিতির সম্মুখীন নয়? **নিজ বা নিজ পরিবারের ক্ষেত্রে যেমন চিন্তাহীনভাবে বেহিসাবি অকাতরে ব্যয় করি ঠিক তেমনিভাবে গোটা উম্মাহর কল্যাণে কিতাল ফি সাবিলিল্লাহতে চিন্তাহীনভাবে বেহিসাবি অকাতরে উদারহস্তে ব্যয় করতে তাহলে কেন আমি পারিনা? ওহে সামর্থ্যবান বা বিত্তশালী ভাই আমার! নিজ ছেলে-মেয়েদের অনিশ্চিত উজ্জ্বল ফিউচার এর বিবেচনা করে ঠিকই কিন্তু আমি দুনিয়ার ব্যাংক-ব্যালেন্স ফুল করে রাখি বা করতে থাকি, কিন্তু গারিব এই দ্বীনের গৌরবদীপ্ত ফিউচার বা স্বীয় পরকালিন সুনিশ্চিত চিরস্থায়ী ফিউচার এর জন্য কি এতোটুকু বা তার চাইতে পরিমাণে কিছুটা অধিক ব্যাংক-ব্যালেন্স জমা কি করেছি যতোটুকু করেছি স্রেফ অল্প কিছুদিনের এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার ব্যাংক-ব্যালেন্সে?**

আসলে উম্মাহর দুর্যোগপূর্ণ এ ক্রান্তিলগ্নে আমাদের জিহাদের পথে এমন এক ঝাঁক আত্মউৎসর্গকারী শক্তিশালী মজবুত দৃঢ় অলরাউন্ডারের প্রয়োজন যারা কিতালের মাঠে নিজ সাধ্যের সবটুকু ঢেলে দিবে। স্পেসিয়ালি – আমাদের এ ভূখণ্ডের বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী আমাদের এমন এক ঝাঁক মজবুত ও শক্তিশালী ডোনার এবং আনসারের প্রয়োজন যারা নিজ মানবিক মৌলিক চাহিদা বা একান্ত জরুরত পুরা করে অবশিষ্ট সব অর্থ বা সম্পদ জিহাদ নামক ব্যাংকে সঞ্চয় করবে, যা একদিন আনলিমিতেড গুনে বর্ধিত হয়ে তার নিকট হাযিরা দিবে ইনশাআল্লাহ্*।

খাদ্য মানুষের মৌলিক চাহিদা ঠিক কিন্তু ব্যয়বহুল ভালো ভালো খাবার দ্বারা দেহ-মন-নফস কে হৃষ্টপুষ্ট করার নিমিত্তে নিজ বেতন বা ইনকাম এর এক বিশাল অংক খরচ করে দেওয়া হয়তো মৌলিক চাহিদা নয়। পোশাক গ্রহণ একান্ত জরুরী বটে

কিন্তু প্রতিনিয়ত মূল্যবান দামী দামী পোশাক আর স্ত্রীর বৈধ শখ অলঙ্কার ক্রয় করে বৈধ বিলাসিতায় মত্ত থাকা হয়তো আমাদের মৌলিক চাহিদা নয়।

সুতরাং আমরা যদি কেবল আল্লাহ্*র সন্তুষ্টির জন্যে পুনরায় ধরণীর বুকে দ্বীন আল ইসলামের গৌরবদীপ্ত মানচিত্র অঙ্কনের তাগিদে একটু কষ্ট হলেও সংযমী হয়ে জীবনধারণ করতে পারি, তাহলে আমরা আমাদের বেতন বা মাসিক আয় থেকে একটা বড় অঙ্ক জিহাদে ব্যয় করতে পারবো। আমরা সবাই তো জানি যে সম্মানিত সাবেকুন আউয়ালুন সাহাবিগণ নিজ সমস্ত অর্থ দিয়ে দিতেন জিহাদের জরুরতে।

" তাবুক অভিযানে আব্দুর রাহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু রেকর্ড পরিমাণ অর্থ প্রদান করেন। আব্দুর রাহমান আট হাজার দিনার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে তুলে দিলে মুনাফিকরা কানাঘুষা শুরু করে দেয়। তারা বলতে থাকে সে একজন রিয়াকার , লোক দেখানই তাঁর উদ্দেশ্য। তাদের জবাবে আল্লাহ্ বলেন – এই তো সেই ব্যক্তি , যার উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হতে থাকবে [তাওবা- ৭১] । অন্য একটি বর্ণনায় আছে – উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর দান দেখে বলে ফেলেন – " আমার মনে হচ্ছে আব্দুর রাহমান গুনাহগার হয়ে যাচ্ছে , সে তাঁর পরিবারের লোকদের জন্য কিছুই রাখেনি। একথা শুনে রাসুল জিজ্ঞেশ করলেন – আব্দুর রাহমান পরিবারের জন্য কিছু রেখেছো কি? জবাবে তিনি বলেন – হ্যাঁ , আমি যা দান করেছি তার থেকেও বেশী ও উৎকৃষ্ট জিনিস তাদের জন্য রেখেছি। রাসুল জিজ্ঞেস করলেন – কতো? তিনি জবাবে বললেন – আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যে রিজিক, কল্যাণ ও প্রতিদানের অঙ্গীকার করেছেন, তাই। "*

"রাসুল সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নবুওয়াতের প্রকাশ্য ঘোষণা দেন, তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট চল্লিশ হাজার দিরহাম ছিল। ইসলামের জন্য তিনি তাঁর সমস্ত সম্পদ ওয়াকফ করে দেন। তেরো বছর পর যখন তিনি রাসুল এর সাথে মাদিনায় হিজরত করেন তখন তাঁর কাছে এ অর্থের মাত্র আড়াই হাজার দিরহাম অবশিষ্ট ছিল। অল্পদিনের মধ্যে অবশিষ্ট আড়াই হাজার দিরহাম-ও ইসলামের জন্য ব্যয় করে দেন। আমার ভাই, চিন্তা করুণ সেই চোদ্দশত বছর আগের চল্লিশ হাজার দিরহাম! আর এ কারণে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন – আমি প্রতিটি মানুষের ইহসান পরিশোধ করেছি কিন্তু আবু

বকরের ইহসান সমুহ এমন যে তা পরিশোধ করতে আমি অক্ষম। তার প্রতিদান আল্লাহ দেবেন। তার অর্থ আমার উপকারে যেমন এসেছে অন্য কারো অর্থ তেমন আসেনি। (আসহাবে রাসুলদের জীবনকথা – প্রথম খণ্ড – পৃষ্ঠা – ২২) "

আবার কেউ নিজ সমস্ত সম্পদকে সমান ২ ভাগে ভাগ করে একভাগ রেখেছেন পরিবারের জন্য আরেকভাগ দিয়েছেন জিহাদে, যেমন উমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু। কেউ আবার নিজ সমস্ত সম্পদকে সমান তিন ভাগে ভাগ করে এক ভাগ দিয়েছেন জিহাদে এবং বাকি ২ ভাগ রেখেছেন নিজেদের জন্য। যেমন উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু।

এখন যদি আমি প্রশ্ন করি যে - আমরা কে কে ঠিক আল্লাহ্*র আরসের নিচে স্থান পেতে চাই? কিংবা আমরা কে কে মর্যাদায় সাবেকুন আউয়ালুন বা প্রথম অগ্রগামীদের কাতারে শামিল হতে চাই? তাহলে মনে হয়না ওয়াজ মাহফিলের প্যান্ডেল এর ন্যায় কারো হাত নিচে থাকবে ।

কিন্তু এখন যদি আমি জানতে চাই – আমরা কে কে আমাদের বেতন বা মাসিক মোট আয়ের এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ তিন ভাগের এক ভাগ আল্লাহ্*র বিধান কায়েমের লক্ষে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহতে দিয়ে দিতে প্রস্তুত আছি? যদিও তাতে আমার জীবনধারণ করতে কিছুটা কষ্টও হয় । হ্যাঁ একটু কষ্ট হবে বটে কিন্তু দুই ভাগ দিয়ে জীবনধারণ অসম্ভব কিছু নয় যাদের বেতন বা আয় একটু ভালো। তো এখন কত জনের হাত উপরে উঠেছে ? বা কতজন এখনই মনে মনে পাক্কা ইরাদা করেছেন যে - এই মাস থেকেই আমি আমার পরিবারিক খরচে কিছুটা সংযমী হয়ে আমার মোট মাসিক বেতন বা আয়ের তিন ভাগের এক ভাগ আল্লাহ্*র রাস্তায় আল্লাহ্*কে কর্যে হাসানা দিয়ে দিবো , আর ইনশাআল্লাহ্* মহা দুর্যোগপূর্ণ সময়ে যার লাভ-আসল সহ আনলিমিটেড বুঝে নিবো।

হে আল্লাহ্* ! যারা হাত তুলেছে বা ইরাদা করেছে আপনি তাঁদের কবুল করুন দয়া করে। আপনি আমাদেরকে এমন এক ঝাঁক অলরাউন্ডার বা ডোনার-আনসার-দায়ী তৈরি করে দিন জিহাদ হবে যাঁদের নেশা এবং জিহাদকে কেন্দ্র করেই যারা ঠিক করবে স্বীয় দুনিয়াবি পেশা । এমন ভাই – কিতাল হবে যাঁদের একমাত্র ক্যারিয়ার এবং শাহাদাহ হবে যাঁদের সেই ক্যারিয়ারে একমাত্র গোল বা অভীষ্ট লক্ষ্য। যা এচিব বা অর্জন করার জন্য তাঁরা হবে তুমুল প্রতিযোগিতায় লিপ্ত এবং সেই

প্রতিযোগিতায় ফাস্ট ডিভিশনে পাশ করার লক্ষে যাঁদের কাজের গতি হবে অত্যন্ত ক্ষিপ্র।

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র দয়াময় আল্লাহ্*রই জন্য, যিনি অত্যন্ত প্রাচুর্যময় ও প্রতাপশালী, বিধানদাতা ও সার্বভৌমত্তের অধিকারী।

প্রিয় ভাই, আশা করি আপনার আন্তরিক দুয়ায় আমাকে ভুলে জাবেন না, যেন অ্যাট ফার্স্ট আমি আমার কথাকে কাজে রূপ দিতে পারি।

ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ...

আর বহু নবী ছিলেন, যাঁদের সঙ্গী-সাথীরা তাঁদের অনুবর্তী হয়ে জেহাদ করেছে; আল্লাহর পথে-তাদের কিছু কষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু আল্লাহর রাহে তারা হেরেও যায়নি, ক্লান্তও হয়নি এবং দমেও যায়নি। আর যারা সবর করে, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন। (আলে ইমরান ১৪৬)

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১০৩০৫

জঙ্গিবাদ জিন্দাবাদ

{সকল জঙ্গি ভাইদের জন্য হাদিয়া}

অশ্বারোহী

Senior Member

০৪-০৩-২০১৮

যখন সমগ্র বিশ্ব সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্যে রুপান্তর করতে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত, হালালকে হারাম আর হারামকে হালাল করণে ব্যস্ত, বিশ্ব কুফুরী শক্তির সাথে তাল মিলিয়ে, সুরে সুর মিলিয়ে এক শ্রেণির নামধারী মুসলমান ও দরবারী আলেমরা মুসলিম উম্মাহর সূর্য সন্তানদের নিয়ে মিথ্যা ও মনগড়া প্রচারণায় ডুবন্ত, আর উম্মাহর এসকল বীর মুজাহিদীনদের মুহাব্বত ভালবাসা উম্মাহর দিল থেকে দূর করার জন্য " জঙ্গিবাদ নিপাত যাক" "ইসলামের সাথে জঙ্গিবাদের কোন সম্পর্ক নেই" "অথবা ইসলাম জঙ্গিবাদ পছন্দ করেনা" এসকল নিফাকপূর্ণ শ্লোগান নিয়ে মাঠে-ময়দানে দৌড়-ঝাপে অতিব্যস্ত, ঠিক সে মূহুর্তে নিজেকে প্রতিবাদ থেকে বিরত রাখা বড়ই দুষ্কর হয়ে পড়লো! তাই যারা জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে নিজেদের লেলিয়ে দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে লিখলাম.....

☞❤❤জঙ্গিবাদ জিন্দাবাদ❤❤

♦ জঙ্গিবাদ নিপাত যাক

বলবে যারা শোন,

ঈমান তাদের অন্তরেতে

থাকবেনা এক কোণও!

♦ বলবে যারা নিন্দাবাদ

জঙ্গিবাদকে জানাই,

ইসলামেতে অংশ তাদের

নেইতো ষোল আনাই!

♦তাইতো বলছি ভেবে-চিন্তে

বলবে তুমি কথা,

ঈমানেতে থাকবে অটল

ছাড়লে কুফুর প্রথা।

♦পড়বেনা তাই ধোঁকায় তুমি

কুফুরী মিডিয়ার ছলে,

সাবধানেতে থাকবে সদা

ঈমান রাখতে হলে।

☞অতএব,

♦জঙ্গিবাদ জিন্দাবাদ!

বলতে তোমার হবেই!!

দিলে তোমার ঈমানখানি

পাক্কা হবে তবেই!

➞তাই, মুমিন হলে!!

স্লোগান তুলো! জোড়সে বলো!!

জঙ্গিবাদ জিন্দাবাদ! ধন্যবাদ জঙ্গিবাদ!!

ধন্যবাদ জঙ্গিবাদ! জঙ্গিবাদ জিন্দাবাদ!!

সেই সত্ত্বার কসম! যার হাতে আমাদের প্রাণ! জিহাদ যদি তোমাদের কাছে জঙ্গিবাদ হয়, তবে আমরা জঙ্গিবাদী! যদি জিহাদ তোমাদের কাছে হয় সন্ত্রাসবাদ, তাহলে আমরা সন্ত্রাসী!! রব্বে কাবার কসম করে বলছি- তোমাদের মত কুকুর, শূকর আর কুফুরবাদীরা আমদেরকে যেই নামেই আখ্যায়িত করুকনা কেন, নিশ্চিত জেনে রেখো! আমরা হচ্ছি উম্মাতে মুহাম্মাদী! তোমাদের মস্তক আমাদের পায়ের তলাতেই স্থান পাবে ইনশাআল্লাহ! অতএব, তোমরা এরজন্য অপেক্ষা করতে থাকো! আর আমরাও তোমাদের বিপরীতটার জন্য অপেক্ষায় আছি!!

{হে নবী আপনি বলে দিন! তোমরা অপেক্ষা করতে থাকো! আর আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় আছি!!}

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৯৪৫২

ইমাম ছাড়া জিহাদ নাই

আল ফিরদাউসি

Member

০৯-১১-২০১৮

ইমাম ছাড়া জিহাদ নেই

পর্ব ১

শয়তানের ওহী: "ইমাম ছাড়া জিহাদ নেই"

মুফতি আব্দুল ওয়াহহাব (দা বা)

PDF ডাউনলোড করে পড়ুন - http://docdro.id/f৪s৭০২T,

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (১১২) وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ(১১৩)

(আর এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু বানিয়েছি জীন ও মানব জাতীর মধ্য থেকে শয়তানদেরকে। তারা ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশ্যে একে অপরকে চাকচিক্যপূর্ণ কথার কুমন্ত্রণা দেয়। আপনার রব চাইলে তারা এরূপ করতে পারতো না।
সুতরাং আপনি তাদেরকে তাদের মিথ্যা রটনায় পড়ে থাকতে দিন। আর কুমন্ত্রণা এ কারণে দেয় যে, যারা আখেরাতের উপর ঈমান রাখে না তাদের অন্তর যেন সেদিকে আকৃষ্ট হয় এবং তারা তা পছন্দ করে আর তারা যেসব অপকর্ম করার তা করতে থাকে।)

[আনআম:১১২-১১৩]

দরবারী আলেমদের নিকট এই শয়তানরাই ওহী করেছে: 'ইমাম ছাড়া জিহাদ নেই।'

#খণ্ডন:

ইমাম দ্বারা কী উদ্দেশ্য? জিহাদের আমীর না'কি খলিফাতুল মুসলিমীন?

যদি জিহাদের আমীর উদ্দেশ্য হয় তাহলে আমরাও আপনাদের কথার একাংশের সাথে একমত। জিহাদের জন্য আমীর বানানো ওয়াজিব আমরাও বলি।

জামাআতবদ্ধ হওয়া ওয়াজিব আমরাও বলি। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার দ্বারা সফলতা আসবে না এতে আমরাও একমত। জিহাদের আমীর না থাকলে একজনকে আমীর বানিয়ে নেয়া ওয়াজিব। এ ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পূর্বে করে এসেছি।

তবে যদি বলা হয়, 'জিহাদের আমীর না থাকলে জিহাদই ফরয নয়' তাহলে এ কথা শরীয়ত বহির্ভূত। আমরা এর সাথে একমত নই। মসজিদের ইমাম না থাকলে ইমাম বানিয়ে নেয়া আবশ্যক তা ঠিক। কিন্তু ইমাম না থাকলে নামাযই ফরয নয়, এটা শরীয়ত বহির্ভূত কথা।

আর যদি ইমাম দ্বারা খলিফাতুল মুসলিমীন উদ্দেশ্য হয়, তাহলে জিজ্ঞাসা করি, 'খলিফাতুল মুসলিমীন ছাড়া জিহাদ নেই' এর দ্বারা কী উদ্দেশ্য?

যদি বলা হয়, 'জিহাদ ফরয, তবে জিহাদ করার জন্য আগে একজনকে খলিফাতুল মুসলিমীন বানিয়ে নিতে হবে' তবে আমরা আপনাদের কথার একাংশের সাথে একমত যে, খলিফাতুল মুসলিমীন বানানো ওয়াজিব।

ইমাম ছাড়া জিহাদ নাই

পর্ব ২

কিন্তু খলিফা বানানো ছাড়া জিহাদ জায়েয হবে না, এ কথার সাথে আমরা একমত নই। কেননা, মুসলমানদের হয়তো খলিফা বানানোর সামর্থ্য থাকবে বা থাকবে না। যদি সামর্থ্য না থাকে, তাহলে খলিফা বানানো ছাড়া জিহাদ করা যাবে না কথাটা অযৌক্তিক।

এতে কেয়ামত পর্যন্ত জিহাদ ও ইসলাম প্রতিষ্ঠার রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে। খেলাফত প্রতিষ্টা এবং খলিফা বানানোর পথও বন্ধ হয়ে যাবে। কাজেই এ ধরণের মন্তব্য সুস্পষ্ট বাতিল না হয়ে পারে না। আর যদি সামর্থ্য থাকে তাহলে খলিফা না বানানোটা মুসলমানদের জন্য গুনাহের কাজ।

কিন্তু এই গুনাহের কারণে জিহাদ ছেড়ে আরেকটা গুনাহে লিপ্ত হতে হবে এটা অযৌক্তিক। তাছাড়া শরীয়তের কোন দলীলে এ কথা বলা হয়নি যে, জিহাদ জায়েয হওয়ার জন্য খলিফা বানানো শর্ত।

আর যদি উদ্দেশ্য হয়, 'খলিফা না থাকলে জিহাদ ফরযই হয় না' তাহলে এটা সম্পূর্ণ শরীয়ত বহির্ভূত কথা।

উপরোক্ত সংশয়গুলোর বিস্তারিত খণ্ডনে যাচ্ছি না।

সংক্ষিপ্তাকারে শুধু কয়েকটি কথা বলব:

এক) জিহাদ ফরয হওয়ার ব্যাপারে অসংখ্য আয়াত ও হাদিস এসেছে, কিন্তু কোন আয়াত বা হাদিসে জিহাদ ফরয বা জায়েয হওয়ার জন্য খলিফা থাকা শর্ত করা হয়নি। জিহাদ শুধু ইমামের দায়িত্ব বলা হয়নি। তবে ইমামের দায়িত্ব সমূহের মধ্যে একটা দায়িত্ব হল জিহাদ করা।

যদি ইমাম না থাকে বা থাকা সত্ত্বেও জিহাদ না করে তাহলে মুসলমানদের নিজেদের ফরয নিজেদেরকেই আদায় করতে হবে।

ইবনে কুদামা রহ. বলেন:

فان عدم الامام لم يؤخر الجهاد لان مصلحته تفوت بتأخيره، وان حصلت غنيمة قسموها على موجب الشرع، قال القاضي وتؤخر قسمة الاماء حتى يقوم إمام احتياطا للفروج.اهـ

“যদি ইমাম না থাকে তাহলে এ কারণে জিহাদ পিছিয়ে দেয়া যাবে না। কেননা, পিছিয়ে দেয়ার দ্বারা জিহাদে নিহিত মাসলাহাত ও কল্যাণসমূহ হাতছাড়া হয়ে যাবে।

গনীমত লাভ হলে হকদারদের মাঝে শরীয়তে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী বণ্টন করে নেবে। তবে কাজী রহ. বলেন, ইমাম নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত সতর্কতাবশত দাসীদের বণ্টন স্থগিত রাখবে। ” [আল-মুগনী: ১০/৩৭৪]

আর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যাওয়ার পর যদি ইমাম জিহাদে যেতে নিষেধ করে তাহলে তার নিষেধ প্রত্যাখ্যান করে জিহাদে যাওয়া ফরয। কেননা, আল্লাহ তাআলার আদেশের সামনে ইমামের নিষেধের কোন মূল্য নেই।

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

“খালেকের নাফরমানীতে মাখলূকের কোন আনুগত্য নেই।”

ইমাম ছাড়া জিহাদ নাই

পর্ব ৩

ইমাম মুহাম্মদ রহ. 'আসসিয়ারুল কাবীর' এ বলেন:

وإن نهى الإمام الناس عن الغزو والخروج للقتال فليس ينبغي لهم أن يعصوه إلا أن يكون النفير عاما.اهـ

"ইমাম যদি লোকজনকে যুদ্ধ করতে এবং কিতালে বের হতে নিষেধ করে, তাহলে তাদের জন্য তার আদেশ অমান্য করা জায়েয হবে না। তবে যদি নফীরে আম এর হালত তৈরী হয়ে যায় তাহলে ভিন্ন কথা।"

ইমাম সারাখসী রহ. এর ব্যাখ্যায় বলেন:

لأن طاعة الأمير فيما ليس فيه ارتكاب المعصية واجب كطاعة السيد على عبده فكما أن هناك بعد نهي المولى لا يخرج إلا إذا كان النفير عاما فكذلك ها هنا. اهـ

"যেখানে ইমামের আদেশ পালন করতে গেলে নাফরমানীতে লিপ্ত হতে হয় না, সেখানে ইমামের আনুগত্য ফরয। যেমন, গোলামের জন্য তার মনিবের আনুগত্য ফরয। নফীরে আম না হলে যেমন মনিব নিষেধ করলে জিহাদে যাবে না, ইমামের ক্ষেত্রেও তেমনি।" [শরহুস সিয়ারিল কাবীর: ২/৩৭৮]

মালিকী মাযহাবের কিতাব 'ফাতহুল আলিয়্যিল মালিক' এ বলা হয়েছে:

قال ابن حبيب سمعت أهل العلم يقولون إن نهى الإمام عن القتال لمصلحة حرمت مخالفته إلا أن يزحمهم العدو وقال ابن رشد طاعة الإمام لازمة , وإن كان غير عدل ما لم يأمر بمعصية ومن المعصية النهي عن الجهاد المتعين.اهـ

"ইবনে হাবীব রহ. বলেন, আমি আহলে ইলমদেরকে বলতে শুনেছি, ইমাম কোন মাসলাহাতের প্রতি লক্ষ্য করে কিতাল করতে নিষেধ করলে তার বিরুদ্ধাচরণ করা হারাম। তবে যদি শত্রু আক্রমণ করে বসে তাহলে ভিন্ন কথা। ইবনে রুশদ রহ.বলেন, ইমাম ন্যায় পরায়ণ না হলেও তার আনুগত্য আবশ্যক, যতক্ষণ না

কোন গুনাহের আদেশ দেন। আর ফরযে আইন জিহাদে বাধা দেয়া গুনাহের কাজ।" [ফাতহুল আলিয়্যিল মালিক: ৩/৩]

আল্লামা ইবনে হাযম রহ. বলেন-

و لا إثم بعد الكفر أعظم من إثم من نهي عن جهاد الكفار و أمر بإسلام حريم المسلمين إليهم ...اهـ

"কুফরের পর কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা থেকে বাধা দেয়া এবং মুসলমানদের ভূমিকে তাদের হাতে সমর্পণ করতে আদেশ করার চেয়ে বড় কোন গুনাহ নেই।" [আল-মুহাল্লা: ৭/৩০০]

অতএব, ইমাম জিহাদে বাধা দিলে তার নিষেধাজ্ঞা মান্য করা যাবে না। শত্রু আক্রমণ করে বসলে আল্লাহ তাআলার আদেশ হল তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা। আল্লাহ তাআলার আদেশের সামনে ইমামের নিষেধের কোন মূল্য নেই।

ইমাম ছাড়া জিহাদ নাই

পর্ব ৪

দুই) ইমাম যদি মুরতাদ হয়ে যায় এবং কিতাল ব্যতীত তাকে হটানো সম্ভব না হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে কিতাল ফরয। যেমনটা হাদিসে এসেছে। এ ব্যাপারে আইম্মায়ে কেরামের ইজমা-ঐক্যমত বিদ্যমান।

এখানে তো মুসলমানদের কোন ইমাম নেই। তাহলে তাদের উপর মুরতাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা ফরয হল কিভাবে ??

এই দুই মাসআলা থেকে স্পষ্টই বুঝে আসে, জিহাদ ফরয হওয়া না হওয়ার সাথে ইমাম থাকা না থাকার বা ইমাম আদেশ বা অনুমতি দেয়া না দেয়ার কোন সম্পর্ক নেই। অন্যথায়, প্রথম মাসআলাতে ইমাম নিষেধ করার পরও জিহাদ ফরয থাকার কথা নয়।

দ্বিতীয় মাসআলাতে ইমাম মুরতাদ হয়ে যাওয়ার পর যখন কোন ইমাম নেই, তখন এই মুরতাদের বিরুদ্ধে কিতাল ফরয হওয়ার কথা নয়। এ থেকে স্পষ্টই বুঝে আসে, জিহাদ স্বতন্ত্র একটা বিধান যার সাথে ইমামের কোন সম্পর্ক নেই। শত্রু আক্রমণ করে বসলেই জিহাদ ফরয হয়ে যায়।

এ কারণেই ইমামের বাধা দেয়াটা তখন নাফরমানি বলে ধর্তব্য হবে। মুসলমানদের জন্য তার নিষেধ মান্য করা জায়েয হবে না। তার আদেশ অমান্য করা তখন ফরয। কিন্তু জিহাদ ছাড়ার কোন সুযোগ নেই।

তদ্রূপ ইমাম মুরতাদ হয়ে গেলে তাকে হটানো ফরয। এই ফরযের সাথে ইমাম থাকা না থাকার কোন সম্পর্ক নেই। আর থাকবেই বা কেন? ইমাম তো নিয়োগ দেয়াই হয় মুসলমানদের দায়িত্বসমূহ যেন শংখলাবদ্ধভাবে আদায় করা যায়।

দায়িত্বসমূহ আগেই ফরয হয়ে থাকে, ইমাম নিয়োগ দেয়া হয় ঐ ফরয হয়ে থাকা দায়িত্বসমূহ জামাআতবদ্ধ হয়ে সুশৃংখভাবে আদায় করার জন্য। ইমাম নিয়োগ দিলে তারপর ফরয হয়, এর আগে ফরয নয়- এমন নয়।

তিন) নামায-রোযা, হজ্ব-যাকাত যেমন ইমামের সাথে খাছ নয় বরং সকল মুসলমানের উপর ফরয, জিহাদও তেমনই। তবে জিহাদ যেহেতু একটি ইজতেমায়ী

আমল, একক ব্যক্তির মেহনতের দ্বারা সফলতা সম্ভব নয়, সেজন্য আমীর না থাকলে একজন আমীর বানিয়ে নেয়া ওয়াজিব।

চার) ইমাম ছাড়া জিহাদ নেই কথাটা ইতিহাস থেকে মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

১. তাতারীরা যখন আব্বাসী খলিফাকে শহীদ করে তখন ৬৫৭ হিজরী থেকে নিয়ে ৬৫৯ হিজরী পর্যন্ত তিন বছর মুসলমানদের কোন খলিফা ছিল না। কিন্তু এরপরও ওলামায়ে কেরাম তাতারীদের বিরুদ্ধে কিতাল ফরয ফতোয়া দিয়েছেন। তাদের বিরুদ্ধে নজিরবিহীন কিতাল হয়েছে। কিন্তু এই প্রশ্ন তখন ওঠেনি, জিহাদ ফরয হবে কেন, খলিফা তো নেই!?

ইমাম ছাড়া জিহাদ নাই

পর্ব ৫

২. ভারতবর্ষ ইংরেজরা দখল করে নেয়ার পর হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী রহ., কাসিম নানুতাবী রহ., রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. শামেলীর জিহাদ করেছেন। তখন তো এই প্রশ্ন তখন ওঠেনি, জিহাদ ফরয হবে কেন, খলিফা তো নেই!?

৩. সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ. দীর্ঘ দিন যাবৎ জিহাদ করেছেন। তখন তো এই প্রশ্ন তখন ওঠেনি, জিহাদ ফরয হবে কেন, খলিফা তো নেই!?

৪. আফগানিস্তানে রাশিয়ার বিরুদ্ধে কিতাল হয়েছে পনের বছর। তখন তো কোন খলিফা ছিল না। আজ যারা বলছে, ইমাম ছাড়া জিহাদ নেই, তারাই তো তখন আফগান জিহাদ নিয়ে গৌরব করত। কিন্তু আজ যখন আমেরিকার বিরুদ্ধে শুরু হয়েছে তখন যেন শরীয়তের মাসআলা পরিবর্তন হয়ে গেছে।

যদি বলা হয়, তখন খলিফা না থাকলেও জিহাদের আমীর ছিল। কিন্তু বর্তমানে জিহাদের কোন আমীর নেই।

উত্তরে বলবো: আমীর কি প্রতি ঘরে ঘরে থাকতে হবে? সারা দুনিয়াতে একজন থাকলে হবে না? পুরো বিশ্বে তানজিম আল-কায়েদার অধীনে জিহাদ চলুমান। আর আলকায়েদা তালেবানদের হাতে বাইয়াত। তাদের নেতৃত্বে সারা দুনিয়াতে জিহাদ চলছে। এটা কি যথেষ্ট নয়?

না কি প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আমীর লাগবে? শরীয়ত কি বলে? বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন থেকে মুসলমানদের শক্তি নষ্ট করতে না এক আমীরের অধীনে ঐক্যবদ্ধ থাকতে?

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا (তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিভেদ করো না।) এর কি অর্থ?

আর যদি তালেবানদের অধীনে জিহাদ পছন্দ না হয় তাহলে কি জিহাদের দায়িত্ব শেষ? অন্য কাউকে আমীর বানিয়ে জিহাদ করা কি ফরয হবে না?

তবে এ ক্ষেত্রে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে একটা হক জিহাদি তানজীম বিদ্যমান থাকার পরও কোন ওযর ব্যতীত তার সাথে মিলিত না হয়ে নতুন তানজীম খোলে মুসলমানদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করার বৈধতা শরীয়ত দেয় কি'না?

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১০৬৬৯

দাম্ভিক আমেরিকার পতনের গল্প শোন

[জিহাদের পথে]

Member

০৯-১৯-২০১৮

যেসব কারণে আল-কায়দা টুইন টাওয়ার-পেন্টাগনে হামলা করলো।

লেখাটির লিংকটি অন্য একটা কাজকরতে গিয়ে হঠাৎ আমার সামনে পড়ে। একভাই তার ফেসবুক আইডিতে পোষ্ট করেছিলেন। আমার কাছে অনেক ভাল লেগেছে যেহেতু এখানে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো বিন্যাস্ত ভাবে পেশ করা হয়েছে। তাই লেখাটি অনেকদিন আগের হলেও এর প্রয়োজনীয়তা এখন আরো বেশী মনে হয়েছে। এই প্রজন্ম এই ঘটনার সত্য ইতিহাস যেন অন্তরে গেঁথে নিতে পারে সেই উদ্দ্যেশ্যেই এখানে পোষ্ট করা। আল্লাহ তায়ালা সকলকেই হকবুঝে আমল করার তৌফিক দিন আমীন!

মূল আলোচনায় যাওয়ার পুর্বে একটা বিষয় পরিষ্কার করা প্রয়োজন, যে লেখাটির শেষ পর্যন্ত পড়া পর্যন্ত নিজের মন মস্তিষ্ককে পশ্চিমা তাগুত মিডিয়ার প্রচারণা থেকে মুক্ত রাখবেন।

আসুন, এবার মূল আলোচনায় সু-স্বাগতম।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন দ্বিতীয় টার্মে শাসনকালে একবার ঘোষণা করলেন যে, 'আমেরিকা তার যোগ্যতা বলে এই পর্যায়ে এসে পৌছেছে যে সমগ্র পৃথিবীবাসীর উচিৎ আমেরিকার অনুসরণ করা; যাতে তারাও আমেরিকার মতো সফল হতে পারে।' বিল ক্লিনটন যখন এই কথা বলেছিলেন তখন আমেরিকার অবস্থা ছিলো যে তাদের প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার পুর্ণ হওয়ার পরও প্রতিবছর জনপ্রতি প্রায় ৫০হাজার ডলার উদ্ধৃত থাকতো। বিশ্বের অন্যান্য দেশ যখন খাদ্য সঙ্কটে ভোগতো তখন আমেরিকা তার অবশিষ্ট খাদ্যকে সমুদ্রে ফেলতো। ক্লিনটন যুগকে আমেরিকার স্বর্ণযুগ হিসেবে ধরা হয়।

ঠিক এই মুহুর্তে ১৯৯৬সালে আমীরুল মুজাহিদীন শায়খ উসামা বিন লাদেন রাহ. আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, মুসলমানদের প্রথম

কিবলা বায়তুল মুকাদ্দস ফিরিয়ে দাও; আরব উপদ্বীপ থেকে ইয়াহুদী-খৃষ্টান মার্কিন সৈন্য হটিয়ে নাও; ইরাক থেকে অবরোধ উঠিয়ে নাও। কারণ তখন আন্তর্জাতিক অবরোধের কারণে ইরাকে প্রায় দশ লাখ শিশু খাদ্য-চিকিৎসার অভাবে মারা যায়।

আমেরিকার কাছে শায়খ উসামার এই ইয়েমেনি হুংকার হাতির পিঠে মশা বসার মতোই মনে হলো। এদিকে উসামা বিন লাদেন শুরু করলেন আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদ। নব্বই দশকে সোমালিয়া থেকে আল- কায়দার মুজাহিদরা মার্কিনিদের তাড়ানোর পর কেনিয়ার নাইরোবিতে অবস্থিত মার্কিন দুতাবাসে হামলা করেন। এরপরে এডেন সাগরে উপস্থিত মার্কিন রণতরীতে হামলা করেন। যেহেতু এসব হামলা আমেরিকার বাহিরে তাই এই সমস্ত হামলা সফল হবার পর শায়খ উসামা চিন্তা করেন আমেরিকার ভেতরে একটি ভয়ংকর হামলা পরিচালন করবেন। এটা এ কারণে যে যাতে করে মানুষের অন্তরে আমেরিকার প্রতি ভীতি দুর হয়ে যায়। মার্কিনিরা যে অপরাজেয় নয় তাও প্রমাণিত হয়ে যায়। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই গাযওয়াজে মেনহাটন রেইড তথা ৯/১১ এর হামলার পরিকল্পনা করা হয়।

আফগানিস্তানে শায়খ উসামার সার্বিক তত্ত্বাবধানে চার আরব ভাইদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই প্রশিক্ষণের প্রধান লক্ষ্য ছিলো আমেরিকার তিনটি প্রধান কেন্দ্রে আঘাত হানা।

১- হোয়াইট হাউজে, কারণ বিশ্ব নির্যাতনের ছক এখানেই আকা হয়।

২- পেন্টাগনে আমেরিকার সামরিক সদর দফতরে এবং

৩- আমেরিকার অর্থনৈতিক মেরুদন্ড টু ইন টাওয়ারে। এই অপারেশনের নাম দেওয়া হয় মেনহাটন রেইড। নির্ধারিত তারিখের কয়েকদিন পুর্বে এইসব ভায়েরা আফগান থেকে আমেরিকার উদ্দেশ্যে রওনা হন। সেখানে পুর্ব থেকেই প্রস্তুত আরো ১৩জন বিমান বিশেষজ্ঞ ভায়ের সাথে যুক্ত হন। এভাবে একত্রিত হলেন মোট ১৭জন ভাই। প্রথমে সিদ্ধান্ত হয় ১০টা বিমান ছিনতাই করবেন। পরে হামলার মূল পরিকল্পনাকারী খালিদ মোহাম্মাদ শেখের পরামর্শে কমিয়ে ৪টায় আনা হয়। নির্ধারিত তারিখে সকাল আটটায় হামলার সময় নির্ধারণ করা হয়। কারণ অন্য সময় হামলা হলে সাধারণ মানুষের বেশি ক্ষতির আশঙ্কা ছিলো।

আলহামদুলিল্লাহ ৪টা যাত্রী বিমান ছিনতাই করা হলো; একটি হোয়াইট হাউজের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। কিন্তু মূল জায়গায় পৌছার পুর্বেই পথিমধ্যে ধ্বংস হয়ে যায়। অন্যটি রওনা হয় পেন্টাগনের উদ্দেশ্যে, যেহেতু পেন্টাগন সামরিক সদর অফিস ছিলো তাই হামলায় পেন্টাগনের কিছু ধ্বংস হয়। আর বাকী দুটো রওয়া হয় বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র ১১০তলার টু ইন টাওয়ারের উদ্দেশ্যে। আল হামদুলিল্লাহ এটি পুরোপুরি সফল হয়। এভাবে সম্পন্ন হয় মেনহাটন রেইড অপারেশন। কিন্তু আমেরিকা মুজাহিদদেরকে বদনামী করার উদ্দেশ্যে শুধু টু ইন টাওয়ারে হামলার কথা বার বার জপে। বাকীগুলো ইচ্ছে করেই চেপে রাখতে চায়। কারণ টু ইন টাওয়ারের কথা বলে মানুষের যতটুকু মুজাহিদবিদ্বেষী করা যাবে; হোয়াইট হাউজ পেন্টাগনের কথা বলে ততটুকু করা যাবে না।

এখন প্রশ্ন হলো, এই হামলাটি কুরআন- সুন্নাহ ও মানবতার দৃষ্টিতে কতটুকু বৈধ হয়েছে? আসুন এর জবাব কুরআন-সুন্নাহ ও মানবাধিকারের আলোকেই খুজে বের করি।

•• কুরআন থেকে

আল্লাহ তাআলা বলেন, ... সম্মানিত মাসই সম্মানিত মাসের বদলা। আর সম্মান রক্ষা করারও বদলা রয়েছে। বস্তুতঃ যারা "তোমাদের উপর সীমালংঘন করেছে, তোমরা তাদের উপর সীমালংঘন কর, যেমন সীমালংঘন তারা করেছে তোমাদের উপর"। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, যারা পরহেযগার, আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন। (সুরা বাকারাহ - ১৯৪)

আর সুরা নাহলের ১২৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঐ পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করবে, যে পরিমাণ তোমাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়। যদি সবর কর, তবে তা সবরকারীদের জন্যে উত্তম।' উক্ত দুটো আয়াতের মধ্যেই তাদের দ্বারা জুলুমের পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। (বিস্তারিত দেখতে তাফসীরে ইবনে কাসীর হাতে নিন) এবার চিন্তা করে বলুনতো ১৯৪৭ সাল ২০০১ সাল পর্যন্ত আমেরিকা ইসরাইলকে সাহায্য করে এবং ৯০দশকে ইরাক আক্রমণ পরে উক্ত দেশে পরে ২০০৩ পর্যন্ত অবরোধ করে যে পরিমাণ জুলুম ও সীমাসংঘন মুসলমানদের উপর করেছে, সে তুলনায় কি ৯/১১ এর বরকতময় হামলার সীমালংঘন বেশি হয়ে গেছে?

•• এবার সুন্নাহ থেকে-

২য় হিজরিতে মক্কার সর্দার আবু সুফিয়ান (তখন অমুসলিম ছিলেন) যখন সিরিয়া থেকে বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে মদীনা হয়ে যাচ্ছিলেন। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম সাহাবা রাজিআল্লাহু আনহুমদেরকে সাথে নিয়ে মক্কার ওই বণিক কাফেলা কেড়ে নেওয়ার জন্যে বের হয়ে হয়েছিলেন। কারণ মুসলমানরা তখন ভালোভাবেই জানতেন যে এই ব্যবসার লভ্যাংশ মুসলমানদের বিরুদ্ধেই ব্যবহৃত হবে, আর এগুলো হলো মুহাজির মুসলমানদের রেখে আসা সম্পদ। তাই এগুলো লুট করা প্রয়োজন। এরই জের ধরে পরে বদর যুদ্ধ হয়। এবার বলুন তো, ওয়ার্ড ট্রেড সেন্টারের মাধ্যমে আমেরিকা যেসব অর্থ উপার্জন করে তা কি ইসলামি আন্দোলন ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয় নি? আমেরিকা কেনো ইসরাইল ও দালাল মুরতাদ মুসলিমদেশের শাসকদেরকে অর্থ দেয়? আমেরিকার কি মুসলিম ভুমির খনিজদ্রব্য লুট করে নি?

•• খন্দকের যুদ্ধের পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবারা মদীনায় বিশ্রাম না নিয়ে আল্লাহর নির্দেশে সরাসরি ইয়াহুদি গোত্র বনী কুরাইজা অবরোধ করেন। পরে যখন ইয়াহুদিরা আত্মসমর্পণ করে তখন ইয়াহুদিদের প্রিয় ব্যক্তি বিশিষ্ট সাহাবী আহত সাদ বিন মুয়াজ রাজি.-এর সিদ্ধান্তে ইয়াহুদি পুরুষদেরকে জবাই করা হয় এবং তাদের স্ত্রী ও শিশুদেরকে বাদী বানানো হয়। পরে সাদ (রাঃ)-এর সিদ্ধান্ত আল্লাহর কাছে পছন্দ হয়েছে বলে ওহি আসে। দেখুন. এখানে পুরুষদের হত্যার ক্ষেত্রে এ কথা বলা হয় নি যে বেসামরিকদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে আর সামরিকদেরকে হত্যা করা হবে। তাহলে কেনো ৯/১১ এ সামরিক বেসামরিকের প্রশ্ন তোলায় হয়?

•• হুদায়বিয়ার সন্ধির মধ্যে একটি শর্ত ছিলো যে যদি মক্কা থেকে কেউ যদি মুসলমান হয়ে মদীনায় আসে তাহলে তাকে মক্কাবাসীর হাওলায় দেওয়া হবে। সেই সুবাদে হযরত আবু জান্দাল ও আবু বসীর রাজি.কে মক্কার কাফিরদের হাতে অর্পণ করা হয়। কিন্তু উনারা মক্কা থেকে পালিয়ে সমুদ্রের উপকুলে গিয়ে আশ্রয় নেন। সেখানে তারা ছোট খাট একটি গেরিলাবাহিনী তৈরি করেন। পরে এরা বিভিন্ন সময় মক্কার বনিক কাফেলায় হামলা শুরু করেন। তখনতো রাসুলুল্লাহ তাদেরকে নিষেধ করে বলেন নি যে তোমরা বেসামরিক কাফের উপর হামলা করিও না। তাহলে

আজ যখন আমাদের ভায়েরা হারবি দেশের উপর হামলা চালান তখন কেনো ওরা এত নাক সিটকায়? (উপরের প্রতিটি ঘটনা সবার কাছে প্রসিদ্ধ. তাই সুত্র দিলাম না। তারপরও যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে দেখুন বুখারী শরীফের কিতাবুল মাগাজি, নবীজীর সীরাত ও বেদায়া ওয়ান নেহায়াহ)

এবার মানবাধিকারের আলোকে

•• আমরা সবাই জানি বর্তমানে ইসরাইল গাজায় নির্বিচারে বিমান হামলা চালাচ্ছে। এর জবাবে আমাদের ভায়েরাও গাজা থেকে হাজার খানেক রকেট ছুড়েছেন। এতে কিন্তু ইসরাইলের অনেক নিরীহ লোক ও বেসামরিক স্থাপনারও ক্ষতি হচ্ছে। কিন্তু এখানে কেউ গাজার রকেট ছোড়াকে অপরাধ হিসেবে দেখছে না। কারণ ইসরায়েল যে পরিমাণ ক্ষতি করছে এ তুলনায় গাজার জবাব কিচ্ছুই নয়। এবার তাহলে বলুন, আমেরিকা যে পরিমাণ ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি করেছে সে তুলনায় কি ৯/১১এর ক্ষতি তেমন কিছু?

আসুন এবার দেখি ৯/১১ এর হামলার পর আমাদের কী কী লাভ হয়েছে

যখন ৯/১১ হামলা হয় তখন রাজনীতি বোঝার মতো আমার বয়েস ছিল না। কিন্তু যতটুকু বুঝতে পেরেছি যে এই ঘটনার পরক্ষণে বিশ্বের সমস্ত মুসলমান আনন্দিত হয়েছেন। কিন্তু যেহেতু মানুষ সর্বদা শক্তির পক্ষে তাই আমেরিকার আগ্রাসনে তারা ফিরে গেলেন সেই ভীরু পুর্বাস্থায় অবস্থায়। কিন্তু যেহেতু মুসলমানরা প্রথমে খুশি হয়েছেন তাই তাদের স্মরণে কুরআনের এই আয়াত পড়ছি- 'যুদ্ধ কর ওদের সাথে, আল্লাহ তোমাদের হস্তে তাদের শাস্তি দেবেন। তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন।' [সূরা তাওবাঃ ১৪]

৯/১১ এর পরে সমগ্র ইউরোপ- আমেরিকা ইসলাম নিয়ে গবেষণায় লিপ্ত হয়। যার ফলে শুধু আমেরিকায়ই ৪৭ হাজার লোক ইসলাম গ্রহণ করে। ইউরোপ-আমেরিকার কোথাও কোনো একটি ঘটনাকে কেন্দ্র এক সাথে এত লোক ইসলাম গ্রহণ করে নি। এটা কি ৯/১১এর বরকতের নিদর্শন নয় ?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকার মাধ্যমে হিটলারের পরাজয়ের কারণে আমেরিকা বিশ্বশান্তির ধ্বজাধারী(?) হয়ে যায়। আর ৮০ দশকে আফগানে জিহাদ

আমেরিকার রহস্যজনক ভুমিকার কারণে আমেরিকাকে অনেক মুসলিম বন্ধু ভাবা শুরু করে। কিন্তু ৯/১১এর পর আজ আমেরিকা বিশ্বের সবার ঘৃণার পাত্রে পরিণত হয়েছে।

ক্লিনটনের আমলে যে আমেরিকা ছিলো বিশ্বের সবচেয়ে ধনী রাষ্ট্র; আজ সে আমেরিকার অর্থনীতি দেউলিয়া হয়ে গেছে। ঋণে জর্জরিত আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পয়সার অভাবে এশিয়া সফর পর্যন্ত বাতিল করতে বাধ্য হয়েছেন। *৯/১১ এর পুর্ব পর্যন্ত আমেরিকার নাম শুনলে সবার অন্তর কেপে উঠত। কিন্তু আজ কি কেউ আমেরিকাকে আগের মতো ভয় পায়? এটা কি আমাদের ওই মাত্র ১৭জন ভায়ের কুরবানীর ফলাফল নয়? আমরা তাদেরকে শহীদই মনে করি। আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান দিন।

এখন হয় তো পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে গেছেন; তাই এ মুহুর্তে আমার এমন কথার রেফারেন্স চাচ্ছেন, এইতো? তাহলে শুনুন, ২০০৬সালে আল কায়দার অফিসিয়াল মিডিয়া আস সাহাব. মেনহাটন রেইড নামে একটি ডকুমেন্টারি ফিল্ম বের করে। যার মধ্যে উক্ত হামলার আলোচনা প্রমাণসহ উপস্থিত করা হয়। আল হামদুলিল্লাহ এই ফিল্মের আরবি ও উর্দু আমার দেখার সুযোগ হয়েছে। এই লিঙ্ক ঘুরে আসুন। তা ছাড়া আলকায়দার বর্তমান আমীর আমীরুল মুজাহিদীন শায়খ আইমান আজ জাওয়াহিরি দা. বা. শায়খ উসামার জীবনী সম্বলিত একটি ভিডিও বার্তা দিয়েছেন। যার নাম হচ্ছে 'আইয়ামি মাআল ইমাম' (ইমামের সাথে আমার দিনগুলো); ভিডিওটির ২য় পর্বে তিনি এই হামলার কথা উল্লেখ করেছেন। এটা দেখতে এই লিঙ্ক গুলো থেকে ভিডিও নামান - হাই, মিডিয়াম, মোবাইল কোয়ালিটি।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১০৮০৮

যারা আমীরের দোহাই দেয়!!!

সারিমুল মাসলুল

Junior Member

০৯-২২-২০১৮

আমীরের জন্যে যারা অপেক্ষমান!!!

আজকের সমাজের উপর প্রবাহিত বাতাসে জিহাদ বিরোধী যেসব খর-কোটা উড়তে দেখা যায় তার একটি হলো, জিহাদের জন্যে আমীর শর্ত।

অনেক ভাই ই আছেন যারা মনে করেন জিহাদের জন্যে আমীর শর্ত,আমীর ছাড়া জিহাদ হবেনা।

এমনকি লেবাসধারী কিছু আলেমের মুখ থেকেও শোনা যায়, জিহাদের জন্যে আমীর শর্ত, যেহেতু আমীর নেই তাই জিহাদও নেই, কিংবা তাদেরকে যখন জিহাদের কথা বলাহয় তখন বলে, আগে আমীরের ব্যাবস্থা হোক পরে জিহাদে যাবো, আমীর ছাড়া তো জিহাদ নেই।

এমন ধারনা পোষনকারী ও ওজর পেশকারী ভাইদের সমিপেই আমার এ পোষ্ট।

প্রিয় ভাই!

আপনার জিহাদ বিরোধী এ কথাটি সুন্নাহ ও বাস্তবতারও বিরোধী।

বিশ্বাস না হয় আসুন!

সুন্নাহ ও বাস্তবতার নিরিখে আপনার কথাটিকে যাচাই করি।

চলুন তাহলে.....

আমরা শরিয়ত এবং বাস্তবতায় দুই ধরনের আমীর দেখতে পাই যথা।

১/ আমীর অর্থাৎ খলিফাতুল মুসলিমীন। যিনি গোটা মুসলিম উম্মাহর প্রতিনিধি হয়ে থাকেন। যেমন, হযরত মুহাম্মাদ সাঃ ও তাঁর পরবর্তি চার খলিফা। যে আমীরকে আমরা খলিফাও বলি।

২/ আমীর, কোন দেশ, গুষ্ঠি বা দলের আমীর। যেমন,দাওয়াতে তাবলীগের আমী,রাজনৈতিক দলের আমীর বা যেকোন দলের আমীর। যাকে আমরা নেতাও বলে থাকি। এখন প্রশ্ন হলো,

আপনি জিহাদের জন্যে যে আমীরের শর্তারোপ করেন, সেই আমীর কোন প্রকারের??

যদি বলেন ১ম প্রকারের আমীর (খলিফাতুল মুসলিমীন)

তাহলে তো আপনার দাবী রাসুল সাঃ এর হাদীসের বিরোধ হয়ে যায়, কেননা মিশকাতুল মাসাবীহতে আবুদাউদ এর সুত্রে বর্নিত হয়েছে যে, হযরত হুযাইফা রাঃ আল্লাহর রাসুল সাঃ কে জিজ্ঞাসা করলেন হে আল্লাহর রাসুল সাঃ এই কল্যাণের (ইসলাম কায়েমের বা খেলাফতের) পর কি কোন অকল্যাণ আসবে??
তিনি বললেন হ্যাঁ।

হুযাইফা রাঃ বললেন,তা হতে উত্তরনের উপায়কি??

তিনি বললেন,তরবারী। মিশকাত,পৃঃ৪৬৩।

উল্যেখিত হাদীসে বলা হয়েছে যে, পুর্নাঙ্গ ইসলাম বা খেলাফত না থাকাবস্থায়, তলোয়ার এর মাধ্যমে খেলাফত ফিরে আসবে। সুতরাং বুঝা গেল, খেলাফতের খলিফা না থাকাবস্থায়ও জিহাদ চলবে।বরং জিহাদের মাধ্যমেই খিলাফাহ ফিরে আসবে।

অন্য এক হাদীসে রাসুল সাঃ বলেছেন, খিলাফত ৩০বছর থাকবে, এরপর রাজতন্ত্র চলে আসবে। তিরমিযী।

অন্যত্র বর্নিত হয়েছে, এর পর রাজতন্ত্র এর পর সৈরতন্ত্র, এরপর আবার খিলাফত আলা মিনহাজিন নাবুওয়্যাহ হবে।

মোটকথা ৩০বছর পর এমন সময় আসবে যখন খিলাফত থাকবে না।আর খেলাফত না থাকলে তো খলিফা থাকার প্রশ্নই আসেনা।

সুতরাং বুঝা গেল খেলাফতের পর এমন সময় আসবে যখন কোন খলিফা বা আমীর থাকবে না।

অথচ আল্লাহর রাসুল সাঃ বলেছেন, আমার উম্মতের একটি দল হকের উপর কিতাল করতে থাকবে, যারা কিয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী থাকবে। আবুদাউদ।

অন্যত্র বলেছেন,

যতক্ষন পর্যন্ত আমার সর্বশেষ উম্মত দাজ্জালকে হত্যা না করবে, ততক্ষন পর্যন্ত জিহাদ চলবে,কোন ন্যায় বিচারকের ন্যায় বিচার বা কোন অত্যাচারীর অত্যাচার তাকে বন্ধ করতে পারবে না। আবুদাউদ।

অন্যত্র বলেছেন, জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত চলবে।

উল্যেখিত হাদীস সমুহ দ্বারা বুঝা যায় রাসুল সাঃ এর হাদীসে বর্নিত খিলাফাত না থাকার সময়েও জিহাদ থাকবে।

সুতরাং একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, আমীর (খলিফাতুল মুসলিমীন) না থাকাবস্থায়ও জিহাদ চলবে।।

সুতরাং আপনার ১ম প্রকার আমীরের ক্ষেত্রে আপনার দেওয়া উত্তর আমরা মানতে পারলাম না।

হে আমার ভাই!

আপনি যদি বলেন,

আমীর দ্বারা ২য় প্রকারের আমীর উদেশ্য।

তাহলে আলহামদু লিল্লাহ!

এমন আমীর জিহাদের ময়দানে অভাব নেই, যারা শরিয়াহ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান রাখেন এবং শরয়ী ভাবে মুজাহিদীনদের পরিচালিত করছেন।

সুতরাং বুঝা গেল জিহাদ ফরজ হওয়ার জন্যে আমীর শর্ত নয়। আর যে আমীরের শর্ত করা হয়, এমন আমীরের অভাব নেই। তাই জিহাদ ফরজ হওয়ার যেসব শর্ত রয়েছে যেমন, মুসলিমদের কোন ভূমি কুফফার কর্তৃক বেদখল হওয়া, কোন মুসলিম ভূমিতে কুফরের আগ্রাসন চললে, কোন মুসলিমকে বন্দি করলে ইত্যাদি শর্ত সমুহ।সেগুলোর কোন একটি বাস্তবায়িত হলেও আমাদের উপর জিহাদ ফরজ হয়ে যাবে।

হে ভাই আমার!

সর্বদ্রষ্টা মহান আল্লাহকে হাজির-নাজির বিশ্বাস করে নিজেকে প্রশ্ন করে দেখুন, ইসলাম ও মুসলিমদের বর্তমান সময়কার মত সঙ্গীন মুহূর্তে আপনার উপর জিহাদ ফরজ হয়েছে কিনা??

এখনো জিহাদে বের হওয়ার সময় হয়েছে কিনা??

আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১০৮৫৫

গণতন্ত্রের মাধ্যমে কি ইসলামী বিপ্লব সম্ভব?

তানভির হাসান

Senior Member

০৯-২৫-২০১৮

গণতন্ত্রের মাধ্যমে কি ইসলামী বিপ্লব সম্ভব?

‘বিষয়টি খুবই গুরুত্বর্পূণ, এবং এ ব্যাপারে যথেষ্ট চিন্তা ও গবেষনার প্রয়োজন। এখানে যে বক্তব্যটি পেশ করছি তা মূলত জামায়াতে ইসলামীর সাথে ভালোভাবে যুক্ত দু’জন বিজ্ঞ ব্যক্তির মধ্যকার আলোচনা। তাঁরা জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কেই আলোচনা করেছেন। কিন্তু আমরা মনে করি যে, এি আলোচনাটির পরিধি ব্যাপক। এ বিষয়টি পাকিস্তানের সকল ইসলামী দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ; বরং এক দৃষ্টিকোণ থেকে গোটা পৃথিবীর ইসলামী দলসমূহের সাথেই বিষয়টি জড়িত। তুরস্কে রয়েছে একটি ইসলামী শক্তিশালী দল, তিউনিসিয়ায় ইসলামী একটি দল আধিক্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, এ দিকে মিসরসহ অন্যান্য জায়গায় ইসলামী আন্দোলনের চেষ্ট চলছে। খোদ পাকিস্তানের এক অংশে ইসলামী দলগুলো বেশ শক্তি অর্জন করে ফেলেছে। এজন্য এ প্রশ্নের উপর যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন যে, পশ্চিমা গণতন্ত্রের মাধ্যমে (বাহ্যিক কিছু পরিবর্তন এনে ‘ইসলামী গণতন্ত্র’ নাম দিয়ে) কি ইসলামী বিপ্লব (অথবা ইসলামের বিজয়, শরিয়ত প্রতিষ্ঠা, নেযামে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইত্যাদি) অর্জন করা সম্ভব? এ বিষয়ে আপনিও একটি মন্তব্য বলুন; আমরা ইনশাআল্লাহ ‘আল-বুরহান’-এর আগামী সংখ্যায় এ বিষয়ে আলোচনা করব।’ – ড.মুহাম্মদ আমিন

৯ থেকে ১৫ পর্যন্ত বিশেষ তারিখে শাহ নেওয়াজ ফারুকী সাহেবের শুক্রবারের আলোচনায় ‘জামায়াতে ইসলামীর অতুলনীয় গবেষনামূলক, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক চেষ্টা-প্রচেষ্টা।’ শিরোনামে যে আলোচনাটি পেশ করেছেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি জামায়াতে ইসলামীর শক্তি বর্ণনা করতে গিয়ে যা বললেন, তা এই,

১. মাওলানা মওদুদী রহ. এর চিন্তাধারা হল, ইসলাম একটি জীবনব্যবস্থা, যা গোটা পৃথিবীর উপর কর্তৃত্ব বিস্তারের দাবি রাখে। যা কার্যতও সম্ভব; এমন কি তা

এখন পৃথিবীব্যাপী একটি কাজে পরিণত হয়েছে। জনাব ফারুকী সাহেবের বক্তব্য, 'জামায়াতে ইসলামীর শক্তি পৃথিবীর অন্য যে কোনো দলের চেয়ে বেশি।' [পৃষ্ঠা:১১]

২. পাকিস্তানে ইসলামী দল হিসাবে জামায়াতে ইসলামীর আগমনকে কেন্দ্র করে যে সব প্রোপাগান্ডা ছড়ান হয়েছে, তা বাস্তবসম্মত নয়। বরং পকিস্তানের আদর্শপরিচয়, প্রতিরক্ষা ও উন্নতির ক্ষেত্রে জামায়াতে ইসলামীর বড় একটি অবস্থান রয়েছে। অন্যদিকে (পাকিস্তানের) লিবারেল ও কমিউনিস্টরা জামায়াতে ইসলামীকে নিজেদের আসল শত্রু মনে করে। [পৃষ্ঠা:১১]

৩. জামায়াতে ইসলামী ছাত্র ও শ্রমিকদলসমূহে কমিউনিস্ট ও লিবারেলদের আধিপত্য উপড়ে ফেলেছে। [পৃষ্ঠা:১১]

৪. জামায়াতে ইসলামী সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও যুদ্ধক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা রেখেছে। জামায়াতে ইসলামীর সহযোগিতা ছাড়া গণতান্ত্রিক ও ইসলামিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। [পৃষ্ঠা:১২]

৫. জামায়াতে ইসলামী উম্মতের ঐক্যের প্রতীক। সেইসাথে জামায়াতে ইসলামী গোটা মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার যোগ্যতা রাখে। [পৃষ্ঠা:১১]

৬. জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে বারবার নির্বাচনী পরাজয়কে বরণ করার অসাধারণ সক্ষমতা রয়েছে। [পৃষ্ঠা:১২]

প্রথম কথা তো এই, শক্তি একটি বহুমুখী ভাবনা। শক্তির শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, উদ্দেশ্য অর্জনে সফল হওয়ার যোগ্যতা। জামায়াতে ইসলামীর লক্ষ্য হল, রেযায়ে ইলাহী অর্জন; এ অর্থে জামায়াতে ইসলামী নিশ্চিত একটি শক্তিশালী দল। মুখলেস লোকেরা এর সঙ্গ দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন। ইনশাআল্লাহ এই লক্ষ্য অর্জনে সফলও হয়ে যেতে পারে। কিন্তু জামায়েতে ইসলামী এ অর্থে শক্তিশালী নয় যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তারা দীনের যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছে তা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রধান্য বিস্তার করছে। আসলে বাস্তবতা হল, যত দিন যাচ্ছে এ নেযামটি ততই দুর্বল হয়ে পড়ছে।

আমার ধারণা, জামায়াতে ইসলামী অনেক সাধনা করে যে শক্তি অর্জন করেছে তা দিনদিন কমেই চলেছে। আমরা যদি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রচলিত কার্য

পরিকল্পনার উপর দ্বিতীয়বার নযর না দিই তাহলে অচিরেই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আমরা নিশ্চিত পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ব।

মুহতারাম ফারুকী সাহেব জামায়াতে ইসলামীর যেসব শক্তির কথা আলোচনা করলেন, যদি আমরা তার পর্যালোচনা করি তাহলে জামায়াতে ইসলামীর কর্মপদ্ধতির দুর্বলতাগুলো আরো পরিস্কার হয়ে যাবে। কর্ম পদ্ধতির দুর্বলতার মূল কারণ হল, মাওলানা মওদুদী রহ. পশ্চিমাকে খালেস জাহিলিয়্যাত সাব্যস্ত করলেও, পশ্চিমা চিন্তা-চেতনা ও কর্মপদ্ধতির উপর তিনি যে পর্যালোচনা পেশ করেছেন তা অপরিপূর্ণ ও আবেগী একটি পর্যালোচনা ছিল। মাওলানা মওদুদী রহ এর আবেগী পর্যালোচনার সবচে' বড় দৃষ্টান্ত তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার মধ্যেই বিদ্যমান। তিনি ইসলামকে একটি পরির্পূণ জীবনব্যবস্থারূপে পেশ করেছেন ঠিক; কিন্তু এই জীবনব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকেই তিনি যথেষ্ট মনে করেছেন। তিনি যে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছেন তা এ দৃষ্টিকোণ থেকে সীমাবদ্ধ যে, তাঁর চিন্তাধারা হল, এর জন্য পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ধ্বংস হওয়া জরুরী নয়। বরং তিনি এ ধরণের সরকারব্যবস্থাকেই দীন বিজয়ের মাধ্যম হিসাবে জোর দিয়ে থাকেন। তিনি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রনীতি ও পুঁজিবাদী শাসনব্যবস্থাকে গতানুগাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মত মনে করেন না। বরং তিনি যখন ইসলামী নেতৃত্বের রূপরেখার কথা আলোচনা করেন তখন গণতান্ত্রিক ধারার সম্রাটদের ব্যাপারে তারদীদের কথা বললেও গণতন্ত্রের ব্যাপারে তারদীদ ফাতওয়া দেন না। তাঁর মতে খেলাফতে রাশেদাও শরী'য়া ভিত্তিক গণতান্ত্রিক ব্যাবস্থা ভিন্ন অন্য কিছু নয়।

মাওলানা মওদুদীর চিন্তাধারাকে সামনে রেখে জামায়াতে ইসলামী যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে (চাই তা পাকিস্তানে হোক, বাংলাদেশে হোক কিংবা হিন্দুস্তানে) প্রকৃত পক্ষে তা গণতান্ত্রিক সেসব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। এই চেষ্টা-প্রচেষ্টার ফলে নবী কারীম সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ থেকে সুলতান আব্দুল হামিদ সানী পর্যন্ত ইসলামী শাসন যেভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তা কোনোদিন আনা সম্ভব নয়। বরং এটি উল্টো গণতান্ত্রিক নেযামকে ইসলামী নেযাম নাম দিয়ে জায়েয সাব্যস্ত করার নামান্তর। গণতান্ত্রিক কাজকর্ম জনগণের শাসনেরই বহিঃপ্রকাশ। আর জনগণের শাসন স্বাধীনতা ও প্রবৃত্তির উন্নতি দান করে, রবের ইবাদত ও আল্লাহর সন্তুষ্টির ক্ষেত্রে উন্নতি দান করতে পারে না।

গতানুগতিক ও গণতান্তিক প্রচেষ্টার সফলতা- চাই তার ধরণ ইসলামী হোক বা গাইরে ইসলামী- রেযায়ে ইলাহীর প্রচেষ্টাকে উন্নত করতে পারে না। এসব আন্দোলন সফল যখন হয় তখন ইসলামী বিপ্লবের প্রচেষ্টা সোশাল ডেমোক্র্যাট ও লেবারেল আদর্শের সঙ্গে মিলে যায়। এ কথাটি লিয়াকত আলী খান সাহেব ১৯৪৯ সালে খুব ভালভাবে অনুধাবন করে ছিলেন। তিনি বলেন, "পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে ইসলামী নাম দিয়ে জায়েয সাব্যস্ত করা, পাকিস্তানে একটি আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে সবচে' বড় বাধা"।

তুরস্কের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রমাণিত হয়েছে যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করে কোনো ইসলামী দল রাষ্ট্রের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে না; বরং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ইসলামী দলের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। আর এ কাজ পাকিস্তানে তো অসম্ভবই; কারণ আমরা নির্বাচনে শুধু হেরেই যাচ্ছি (এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের উপর বড় এহসান)। এ দিকে আরববিশ্বের বর্তমান অবস্থার ফলাফল তো পরিস্কার। যদি এ কথা সঠিক হয়ে থাকে যে, আরবের ইসলামী আন্দোলনগুলো মাওলানা মওদুদী রহ. এর গবেষনার ফসল, তাহলে আমি আবারো বলব যে, এই চিন্তাধারা ও মানসিকতা এক দিক থেকে গোটা মুসলিম বিশ্বে গণতান্ত্রিক ব্যাবস্থাকে ইসলামের নাম দিয়ে জায়েয সাব্যস্ত করা, ও অপর দিকে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হওয়ার ক্ষেত্রে অনেক বড় অবদান রেখেছে। এই কথাটি এ বিষয়ের কারণেও পরিস্কার যে, ইসলামী দল, ছাত্র ও শ্রমিক দল, জাতীয়তাবাদী দল, সোশাল ডেমোক্র্যাট পার্টি বা ইউনিয়নসমূহের ইশতেহার ও কার্যপদ্ধতির মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না।

গণতন্ত্রিক ব্যবস্থা আচরণগতভাবে সেক্যুলারাইজেশনকে বাস্তবায়ন করার সর্বোৎকৃষ্ট প্রক্রিয়া। আসলে যখন থেকে গণতন্ত্র সবার কাছে গৃহিত হতে শুরু করেছে, সেভাবে দ্বীনের মজবুতিও নিঃশেষ হতে শুরু করেছে। এ কারণে সেক্যুলার দলগুলতো তো বটেই ইসলামী দলগুলোর জন্যও তাদের কর্মীদের থেকে কুরবানী চাওয়াও মুশকিল হয়ে পড়েছে। এক দিকে খালেস ইসলামী দলগুলোর আলোচনা মতাদর্শহীনভাবে থেকে যাচ্ছে; অপরদিকে তাঁরা তাদের কর্মপন্থা ধীরে ধীরে সেক্যুলার বানাতে বাধ্য হচ্ছে; কেননা, সেক্যুলার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় কোনো বিষয় গৃহিত হওয়া শুধু জনসাধারণের অধিকার ও স্বার্থের সাথেই নির্ধারিত। এ অবস্থাগুলোতে খালেস ইসলামী দলসমূহ নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে

রাখার জন্য নেযামের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টির স্থলে দল থেকে পলায়ন করার উপর বাধ্য হচ্ছে। এ আশঙ্কার কথা মাওলানা আমিন আহসান ইসলাহী ১৯৫৭ সালে মাছিগোটের ইজতেমায় আলোচনা করেছিলেন। তিনি বলেন, 'কত দল প্রতিষ্ঠা হচ্ছে মহান লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য; কিন্তু দলগুলো প্রতিষ্ঠা লাভের পর ধাপে ধাপে তা নিজেই স্বতন্ত্র একটি লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে পরিণত হয়ে যাচ্ছে, আর আসল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।'

আজ জামায়াতে ইসলামী (বিশেষকরে করাচীতে) নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য সেক্যুলার শক্তিগুলোর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া থেকে পালাতে শুরু করেছে এবং গণতান্ত্রিক কাজকর্ম থেকেও পানাহ চাচ্ছে। এ বিষয়টি এ কথার প্রমাণ যে, কর্মীদের মধ্যে ইসলামের মজবুতী ও শাহাদাতের আগ্রহ নিঃশেষ হতে শুরু করেছে। যত দিন যাবে সেক্যুলারাইজেশনের কাজকর্ম জামায়াতে ইসলামীকে ততই একটি সাধারণ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে থাকবে। চলমান প্রক্রিয়ায় জামায়াতে ইসলামীর শক্তি বেড়েও যেতে পারে এ দৃষ্টিকোণ থেকে যে, তখন গণতান্ত্রিক কাজকর্ম ইসলামের নামে জায়েয হিসাবে জনসাধারণ সবাই মেনে নিবে। এ অর্থে নয় যে, হুকুমতে ইলাহী প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে। কেননা, জনসাধারণের ইচ্ছার সাথে সম্পর্কিত বিধান আবশ্যকীয়ভাবে আল্লাহর ইবাদতকে নাকচ করে দেয়। যদি ইসলামী বিপ্লবকে স্থায়ী করতে হয় এ দৃষ্টিকোণ থেকে যে, যেন আমাদের শক্তি হুকুমতে ইলাহীর জন্য ব্যয় হয়, তাহলে আবশ্যকীয়ভাবে মাওলানা মওদুদী রহ. এর গবেষনার পূর্ণতা দানের প্রতি আমাদের মনোনিবেশ করতে হবে। আর যদি হয় ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা , তাহলে তাকে বাস্তবায়ন করার জন্য একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা জরুরী। যে ইসলামী রাষ্ট্রের নাম হচ্ছে খেলাফত, ইমারত, সালতানাত; কিন্তু গণতন্ত্র নয়। বাস্তবতা হল, গণতান্ত্রিক ধারায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব।

জামায়াতে ইসলামীর জন্য এমন চেষ্টা-সাধনা শুরু করা দরকার, যার প্রভাবে বরং সেক্যুলার প্রতিষ্ঠানসমূহও ইসলামী শাসনের অধীনস্ত হওয়ার যোগ্য হয়ে যাবে। ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা গতানুগতিক কোনো মতবাদের অনুসরণ করতে পারে না। না এই ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা শুরু করার জন্য অন্য একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত থাকা বা পাওয়া আবশ্যক। মসজিদ ভিত্তিক ইত্তেহাদ হচ্ছে এসব ইদারার ভিত্তি। জামায়াতে ইসলামীর এ কথাটি খুব ভালভাবে বোঝা দরকার যে, এর মূল

সম্বোধিত ব্যক্তি জনসাধারণ নয়; বরং গোটা দেশের ইসলামী তানযীম ও ইদারাসমূহের কর্মীরা। ইসলামী বিপ্লব এ বিষয়ের দাবি রাখে যে, তার কর্মীদেরকে দেশের সব জায়গায় ছড়িয়ে দিয়ে লক্ষ লক্ষ মসজিদে সমাবেশ করবে এবং মহল্লা ও বাজারের প্রঙ্গনসমূহে আলোচনার মাধ্যমে এ শক্তিকে সেক্যুলার রাষ্ট্রীয় ইদারার পরিবর্তে মসজিদে স্থানান্তর করবে। এ পদ্ধতিকে ইসলামী বিপ্লবের কাজকর্মের ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়। শক্তির এ নতুন ধারায় আমরা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করে চ্যালেঞ্জ ছুড়তে চাই।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১০৯০৮

মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ব্যাপারে সালাফগণের অবস্থান –সত্যিকারের খারেজি কারা?

তানভির হাসান

Senior Member

০৯-২৬-২০১৮

ইমাম নববী রাহ: বলেন:

আল-ক্বাদ্বি ‘ইয়াদ্ব বলেছেন, ‘উলামাদের ইজমা হল নেতৃত্ব (ইমামাহ) কখনো কাফিরের উপর অর্পণ করা যাবে না, আর যদি (কোন নেতার) তার পক্ষ থেকে কুফর প্রকাশিত হয় তবে তাকে হটাতে হবে... সুতরাং যদি সে কুফর করে, এবং শারীয়াহ পরিবর্তন করে অথবা তার পক্ষ থেকে গুরুতর কোন বিদ’আ প্রকাশিত হয়, তবে সে নেতৃত্বের মর্যাদা হারিয়ে ফেলবে, এবং তার আনুগত্য পাবার অধিকার বাতিল হয়ে যাবে, এবং মুসলিমদের জন্য আবশ্যক হয়ে যাবে তার বিরোধিতা করা, বিদ্রোহ করা, তার পতন ঘটানো এবং তার স্থলে একজন ন্যায়পরায়ণ ইমামকে বসানো – যদি তারা (মুসলিমরা) সক্ষম হয়। যদি একটি দল (তাইফা) ব্যাতীত অন্যান্য মুসলিমদের পক্ষে এটা করা সম্ভব না হয়, তবে যে দলের (তাইফা) সক্ষমতা আছে তাদের জন্য এই কাফিরের (শাসকের) বিরোধিতা করা, বিদ্রোহ করা এবং তার পতন ঘটানো অবশ্য কর্তব্য। আর যদি শাসক কাফির না হয়ে শুধুমাত্র বিদ’আতী হয় তবে, এটা বাধ্যতামূলক হবে না, যদি তারা (তাইফা) সক্ষম হয় তবে তারা তা করবে। আর যদি কেউই সক্ষম না হয় এ ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়, তবে বিদ্রোহ করা আবশ্যক না, তবে তখন মুসলিমদের সেই ভূমি থেকে অন্য কোথাও হিজরত করতে হবে, নিজেদের দ্বীনের সংরক্ষণের জন্য।”[সাহিহ মুসলিম বি শারহ আন-নাওয়াউয়ী, ১২/২২৯]

হাফিয ইবনে হাজার আল আসকালানী রাহ: বলেন:

“আদ দাউদী বলেছেন, “উলামাদের ইজমা হল, অত্যাচারী (মুসলিম) শাসককে যদি ফিতনাহ (যুদ্ধ) ব্যতিত অপসারণ করা সম্ভব হয় তবে তা করা ওয়াজিব; কিন্তু যদি এতে ফিতনাহ (যুদ্ধ)শুরু হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে তাহলে ধৈর্য ধারণ করা

বাধ্যতামূলক। এবং কোন কোন আলিমগণের দৃষ্টিভঙ্গি এমন যে, ফাসিক ব্যক্তিও শাসন কার্যের জন্য অনুমোদিত নয় যদি সে পূর্বে থেকেই ফাসিক হয়ে থাকেন। কিন্তু যদি এমন হয় যে, তাকে শাসক বানানোর সময় তিনি ফাসিক ছিলেন না পরবর্তীতে ফিস্*কে লিপ্ত হয়েছেন তবে এমন ফাসিক শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ব্যাপারে আলিমগণ মতভেদ আছে। এক্ষেত্রে সঠিক মত হলো তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নিষিদ্ধ।

কিন্তু যে শাসক 'কুফর' এ লিপ্ত হন তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ওয়াজিব।" (ফাতহুল বারী ১৩/১০)

ইবনে হাজার রাহ: সালাফগণ থেকে বর্ণনা করেন:

"(তাওহীদীবাদী মুসলিম)ফাসিক শাসকের আনুগত্য এবং তার পক্ষ নিয়ে জিহাদ করা বৈধ এ ব্যাপারে ফকিহগণের ইজমা' আছে। তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এবং অনেকের রক্ত ঝরানোর চেয়ে বরং তার আনুগত্য করাই উত্তম। শাসকদের থেকে সুস্পষ্ট কুফ্*র প্রকাশ পাওয়া ব্যতিত এক্ষেত্রে আনুগত্যের ব্যাপারে ফকিহগণ কোন ছাড় দেননি। অপরদিকে শাসকের থেকে কুফর প্রকাশিত হলে সেই কুফরের ওপর তার আনুগত্য করা যাবে না, বরং তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তির উপর ওয়াজিব। (ফাতহুল বারী ৯/১০)

যে শাসকেরা ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের থেকে জিযয়াহ আদায় করেনা, এবং কুফ্*ফারদের বিরুদ্ধে জিহাদকে নিষিদ্ধ করে তাদের ব্যাপারে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রাহঃ বলেছেন –এসব কাজ করতে অস্বীকৃতি জানানো যেকোন দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে, তারা যদি এসব কাজের আবশ্যিক হওয়াকে স্বীকারও করে, তবুও। এবং এ ব্যাপারে এর বিপরীত কোন মত আমার জানা নেই।(মাজমু আল-ফাতাওয়া, ২৮/৫০৩,৫০৪)

সুতরাং মুরতাদের শাসকের ব্যাপারে অবস্থান স্পষ্ট।

এ সকল ফক্কিহগণের বক্তব্য থেকে সুস্পষ্টভাবে এটা পরিস্কার হলো যে, 'ফাসিক' যালিম শাসক এবং মুবতাদি (বিদাতি) শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মধ্যে ফকিহগণ পার্থক্য করেছেন। তার মধ্যে কিছু ফকিহ বিদ্রোহের ক্ষেত্রে শর্ত দিয়েছেন 'ফিতনাহ ব্যতিত অপসারণ করার সক্ষমতা"।

যেমন ক্বাযী ইয়ায রাহ: বলেছেন; "আর যদি শাসক কাফির না হয়ে শুধুমাত্র বিদ'আতী হয় তবে, এটা বাধ্যতামূলক হবে না, যদি তারা (তাইফা) সক্ষম হয় তবে তারা তা করবে।"

এবং আদ দাউদী রাহ: বলেন, "উলামাগণ এ ব্যাপারে একমত যে, জালিম শাসককে যদি ফিতনা (যুদ্ধ) ব্যতিত অপসারণ সম্ভব হয় তবে তা ওয়াজিব হবে।"

কিন্তু যে শাসক কুফরে লিপ্ত তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে তারা শুধু অনুমোদনই করেননি বরং তাদের ইজমা হল (অর্থাৎ তাঁরা ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে), এমন শাসককে অপসারণ করতেই হবে প্রয়োজনে রক্ত ঝড়িয়ে হলেও।

যেমন ইবনে হাজর রাহিঃ বলেছেন, 'কিন্তু যে শাসক 'কুফর' এ লিপ্ত হন তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ওয়াজিব।', এবং 'শাসকের থেকে কুফর প্রকাশিত হলে সেই কুফরের ওপর তার আনুগত্য করা যাবে না, বরং তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তির উপর ওয়াজিব।'

এবং ক্বাযী ইয়ায রাহ: বলেছেন, "যদি নির্দিষ্ট জামাত ছাড়া অন্যদের জন্য বিদ্রোহ করা সম্ভব না হয় তবে সে জামাতের উপর ওয়াজিব হবে উক্ত কাফির শাসকের বিরুদ্ধে জিহাদের ঝান্ডা উত্তোলন করা এবং সে (কাফির) শাসককে অপসারণ করা।" 'যদি একটি দল (তাইফা) ব্যাতীত অন্যান্য মুসলিমদের পক্ষে এটা করা সম্ভব না হয়, তবে যে দলের (তাইফা) সক্ষমতা আছে তাদের জন্য এই কাফিরের (শাসকের) বিরোধিতা করা, বিদ্রোহ করা এবং তার পতন ঘটানো অবশ্য কর্তব্য, ওয়াজিব।'

সুতরাং

যে সকল মুজাহিদীনগণ এমন কাফির-তাগুত শাসকের বিরুদ্ধে জিহাদের ঝান্ডা উত্তোলন করেন তাদেরকে 'খাওয়ারিজ' বলা কি ন্যায়সঙ্গত? অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রকৃত খাওয়ারিজদের সম্পর্কে এভাবে বলেছেন; "তারা ইসলামের অনুসারীদেরকে হত্যা করবে, এবং মুর্তিপূজারীদেরকে ছেড়ে দিবে" [সহিহ বুখারি]

আজ কারা তাওহীদের সৈনিকদেরকে হত্যা করছে, বন্দী করছে, তাদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি করছে, নির্যাতন করছে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাদেরকে গ্রেফতার করে জায়নিষ্ট এবং ক্রুসেডারদের কাছে হস্তান্তর করছে?

আজ কারা বিশ্বব্যাপী লাখো মুসলিমদের হত্যাকান্ডে ক্রুসেডারদেকে সহায়তা করছে? এবং মুহাম্মাদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আরব উপদ্বীপে ক্রুসেডারদেরকে ঘাঁটি গাড়তে দিচ্ছে? তাদের আশ্রয় প্রদান অব্যাহত রেখেছে?

আজ কারা কেবল মুশরিকদের ছেড়েই দিচ্ছে না, বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আরব উপদ্বীপে অবস্থান করা তারা প্রতিটি জায়নিষ্ট ও ক্রুসেডারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করছে?

আজ কারা কারা হোয়াইট হাউজের কুফফারদের মানোতুষ্টির জন্য মুসলিমদেরকে হত্যা করছে?

কারা মুজাহিদীনের বিরুদ্ধে ক্রুসেডারদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করছে?

কারা জায়নিষ্ট ও ক্রুসেডারদের তৃষ্ণা মেটাতে যে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করতে পারে, আবার একইসাথে নিজেদের মুসলিম দাবি করার দুঃসাহস দেখাতে পারে?

আজ কারা মুসলিমদের থেকে জিযয়া গ্রহণ করে জায়নিষ্ট ও ক্রুসেডারদেরকে অনুদান দিচ্ছে?

কারা ক্রুসেডারদের পাশে নিজেকে নিরাপদ ভাবতে পারে আর মুজাহিদদের পাশে অনিরাপদ মনে করে?

ভাবুন, চিন্তা করুন, তাহলে হয়তো আপনার কাছে পরিষ্কার হবে কারা আসল খাওয়ারিজ...

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১০৯৪৫

বর্তমান মুসলিমপ্রধাণ রাস্ট্রগুলো দারুল হারব কেন?

তানভির হাসান

Senior Member

০৯-২৫-২০১৮

বর্তমান মুসলিমপ্রধাণ রাষ্ট্রগুলো দারুল হারব কেন?

ফকিহুন নফস রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি রহঃ

মুফতি আব্দুল ওয়াহহাব রহঃ

অনুবাদকের কথাঃ

দারুল ইসলাম ও দারুল হরবের মাসআলা ইসলামী শরীয়তের একটি বুনিয়াদী মাসআলা যার উপর আরোও অসংখ্য মাসআলার ভিত্তি। ফিকহ তথা ইসলামী আইন শাস্ত্রের প্রায় সকল কিতাবে এর আলোচনা রয়েছে এবং এর উপর ভিত্তি করে অসংখ্য অগণিত মাসআলা বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উসমানী খেলাফতের পতনের পর যখন কাফেররা বিশাল খেলাফতকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে একেক অংশে মুসলিম নামধারী একেক মুরতাদকে শাসন ক্ষমতায় বসায় তখন নতুন করে এ মাসআলার আলোচনার প্রয়োজন পড়ে।

কেননা আইম্মায়ে কেরাম একমত যে, ইসলামী শাসনাধীন কোন রাষ্ট্র কাফের বা মুরতাদরা দখল করে নিয়ে তাতে কুফরী তথা শরীয়ত বিরোধী বিধান চালু করে দিলে এবং মুসলমানরা তাদের থেকে তা উদ্ধার করে ইসলামী শাসন জারি করতে অক্ষম হয়ে পড়লে উক্ত রাষ্ট্র আর দারুল ইসলাম তথা ইসলামী রাষ্ট্র থাকে না, বরং দারুল কুফর তথা কুফরী রাষ্ট্র হয়ে যায়। এ ব্যাপারে আইম্মায়ে কেরামের মাঝে কোন দ্বিমত নেই।

এ হিসেবে বর্তমানে শরীয়ত বিরোধী কুফরী আইন দ্বারা শাসিত মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সবগুলো আইম্মায়ে কেরামের সকলের ঐক্যমতে দারুল হরব।

মাসআলাটির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য করে অনেকেই এ ব্যাপারে কম বেশ লেখালেখি করেছেন।

এ সংক্রান্ত যে সব লেখা আমার পড়া হয়েছে সেগুলোর মধ্যে আমার ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে অত্যন্ত তাহকীকী, বিশ্লেষণধর্মী ও সংশয় নিরসক মনে হয়েছে ফকীহুন নফস, আবু হানিফায়ে যমান, কুতুবুল ইরশাদ হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) এর ঐ ফতোয়াটি যা তিনি ইংরেজদের দখলে থাকা তৎকালীন উপমহাদেশকে দারুল হরব ফতোয়া দিয়ে জারি করেছিলেন।

১৮০৬ সালে শাহ আব্দুল আজীজ (রহ.) উপমহাদেশকে দারুল হরব ফতোয়া দিয়েছিলেন। কালের বিবর্তনে সেই ইংরেজ শাসনামলেই কেউ কেউ উপমহাদেশ দারুল হরব হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে। তখন গাঙ্গুহী (রহ.) পুনরায় উপমহাদেশকে দারুল হরব ঘোষণা করে দলীল-প্রমাণ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ দীর্ঘ এক ফতোয়া জারি করেন। এই পুস্তিকায় এই ফতোয়ারই অনুবাদ করা হয়েছে।

গাঙ্গুহী (রহ.) যদিও শুধু উপমহাদেশকে দারুল হরব ঘোষণা করে এই ফতোয়া দিয়েছিলেন, কিন্তু কালের বিবর্তনে আজ সমগ্র মুসলিম বিশ্বের উপর এই ফতোয়া প্রযোজ্য হয়ে পড়েছে। মুরতাদদের দখলে থাকা সবগুলো মুসলিম রাষ্ট্র আজ এই ফতোয়ার আলোকে দারুল হরব প্রমাণিত হয়েছে।

কেউ কেউ হয়তো বলবেন, এসব রাষ্ট্রকে দারুল হরব বানানোর কী প্রয়োজন আপনাদের ?

উত্তরে বলবো, নতুন করে দারুল হরব বানাচ্ছি না। পূর্ব থেকে দারুল হরব হয়েই ছিল। আমরা শুধু প্রকাশ করছি এবং তা দ্বীনী দায়িত্ব মনে করেই করছি।

যদি এটা আমাদের অপরাধ হয় তাহলে মুরতাদকে মুরতাদ বলাও অপরাধ হবে! জালেমের বিরোদ্ধে কথা বলাও অপরাধ হবে! দ্বীন ধ্বংস হতে দেখেও দ্বীনের দুশমনদের বিরুদ্ধে কথা বলা অপরাধ হবে! আর যদি এগুলো অপরাধ না হয় তাহলে দারুল হরবকে দারুল হরব বলা অপরাধ হবে কেন ?

তাছাড়া আমরা নিজেদের থেকে কিছু বলছি না। আমাদের আইম্মা ও আকাবিরগণ যা বলে গেছেন সেই আলোকেই বলছি। কাজেই সমালোচক ভাইদের প্রতি

অনুরোধ আপনারা দলীল ছাড়া কোন সমালোচনা করবেন না। যা বলবেন দলীল দিয়ে বলবেন।

মূল ফতোয়াটি ফারসী ভাষায় লিখিত। বিশিষ্ট সাধারণ সকলের ফায়েদার প্রতি খেয়াল করে মুফতী শফী (রহ.) উর্দুতে এর তরজমা করে দিয়েছেন। আমি এ উর্দু তরজমা থেকেই তরজমা করেছি। উর্দু তরজমাটি "জাওয়াহিরুল ফিকহ" এর পঞ্চম খন্ডে ছাপানো আছে। "তা'লীফাতে রশীদিয়্যাহ্" তে উর্দু তরজমা সহ মূল ফতোয়াটি ছাপা আছে। "বাক্কায়া ফাতাওয়া রশীদিয়্যাহ্" তে সূদীর্ঘ যে সওয়ালের জওয়াবে তিনি ফতোয়াটি লিখেছিন সেই সওয়াল সহ ছাপা আছে। আপনারা চাইলে এ সব কিতাবে দেখে নিতে পারেন।

মুফতী শফী (রহ.) তরজমার শুরতে ফতোয়ার ডকুমেন্ট এবং দারুল হরব দারুল ইসলাম মাসআলার গুরুত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত একটি ভূমিকা লিখেছেন। আমি সেটিরও তরজমা করে মূল ফতোয়ার শুরতে জুড়ে দিয়েছি। মূল ফতোয়ায় বিভিন্ন কিতাব থেকে ৯/১০টি আরবী ইবারত [বক্তব্য] আনা হয়েছ। গাঙ্গুহী (রহ.) সেগুলোর কোন তরজমা করেননি। মুফতী শফী (রহ.) সেগুলোর তরজমা করেছেন। আমি সে তরজমাই বহাল রেখেছি।

তবে ফতোয়ার শেষ দিকে "রদ্দুল মুহতার" থেকে যে দুইটি ইবারত আনা হয়েছে তাতে ছাপাজনিত ভূল লক্ষ্য করা গেছে। এ জন্য মূল কিতাব দেখে শুদ্ধ ইবারত এনে সে অনুযায়ী তরজমা করে দিয়েছি।

ফতোয়াটি বুঝার সুবিধার্থে ফাঁকে ফাঁকে আমার নিজের পক্ষ থেকে ব্যাখ্যামূলক দু' চার শব্দ সংযোজন করেছি। সেগুলোকে আলাদাভাবে বুঝানোর জন্য থার্ড ব্র্যাকেট [] ব্যবহার করেছি। মুফতী শফী (রহ.) নিজের থেকে যা বাড়িয়েছেন তা ফার্স্ট ব্র্যাকেট ( ) এ দেয়া হয়েছে।

হযরত গাঙ্গুহী (রহ.)মূল ফতোয়ার কোন নাম দেননি। সহজতার জন্য মুফতী শফী (রহ.) এর নাম রেখেছেন-

)فيصلة الأعلام في دار الحرب و دار الإسلام(

[দারুল হরব এবং দারুল ইসলামের ব্যাপারে মহামনীষীগণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত]

পরিশেষে আল্লাহ্ তাআলার কাছে প্রার্থনা তিনি যেন মূল ফতোয়া এবং তার উর্দু তরজমার সাথে আমার এ বাংলা তরজমাকেও কবুল করে নেন এবং আমাদেরকে বর্তমান বিশ্বের দারুল ইসলাম ও দারুল হরবগুলো সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভের তাওফীক দান করেন। আমীন!

– মুফতি আব্দুল ওয়াহহাব

মুফতী শফী (রহ.) এর ভূমিকাঃ

হিন্দুস্তানে যেহেতু মুসলিম-অমুসলিম উভয়েরই বসবাস, হুকুমত এবং ক্ষমতা রয়েছে ; আবার এ সবের পরিবর্তনের সাথে সাথে ইসলামের অনেক বিধান পরিবর্তন ও ভিন্ন হয়ে যায়-এ কারণে হিন্দুস্তান দারুল ইসলাম না দারুল হরব এই মাসআলা দীর্ঘ দিন ধরে আলোচিত হয়ে আসছে।

এই ধারাবাহিকতায় আজ হিন্দুস্তান দারুল হরব হওয়ার ব্যাপারে কুতুবে আলম, যামানার জুনাইদ [বাগদাদী], যুগের আবু হানিফা হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) এর ঐ ফতোয়াটি প্রচার করা হচ্ছে যা তিনি তাঁর কোন আহলে ইলম শাগরেদের প্রশ্নের জওয়াবে মুফাসসাল [বিস্তারিত] এবং মকাম্মাল [পরিপূর্ণ] করে লিখেছিলেন।

হযরত মামদূহ [অর্থাৎ প্রশংসার্হ গাঙ্গুহী (রহ.)] এর সাহেবযাদা হযরাতুল আল্লামা মাওলানা হাকীম মাসউদ আহমদ সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি ফতোয়াটির এক কপি আমাকে দিয়েছিলেন। তাছাড়া হযরতের অনেক আত্মীয় এবং শাগরেদের নিকট ফতোয়াটির কপি বিদ্যমান রয়েছে।

এই মাসআলার [অর্থাৎ দারুল ইসলাম–দারুল হরব মাসআলার] জরুরত এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে এর গুরুত্বঃ

যারা ফিকহ [তথা ইসলামী আইন শাস্ত্র] ও ফতোয়ার সাথে সম্পর্ক রাখেন তাদের নিকট অস্পষ্ট নয় যে, নামায-রোযা, হজ্ব-যাকাত, বিবাহ-তালাক, (বিশেষত : ক্রয়-বিক্রয় ও ইজারা) এবং অন্যান্য মুআমালা সহ ফিকহের প্রায় সকল অধ্যায়ের অসংখ্য শরয়ী মাসআলা দারুল ইসলামে এক রকম, দারুল হরবে অন্য রকম।

এ কারণে যদি বলা হয়, "শরীয়তের আহকামের একটা বিশাল বড় অংশ এমন রয়েছে যেগুলোর উপর আমল করার জন্য প্রথমে বসবাসরত রাষ্ট্র কি দারুল ইসলাম না দারুল হরব তা নির্ণয় করে নেয়া পূর্বশর্ত" তাহলে তা সম্পূর্ণ সঠিক। এ কারণেই দীর্ঘ দিন ধরে হিন্দুস্তানী ওলামাদের নিকট এই মাসআলা আলোচিত হয়ে আসছে।

কুতুবে আলম হযরত মাওলানা গাঙ্গুহী – কুদ্দিসা সিররুহু – এর নিকটও এই মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হয়। হযরত সময়ের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য করে আপন অভ্যাসের বিপরীত অত্যন্ত ব্যাখ্যাবহুল এবং বিস্তারিত এক জওয়াব [অর্থাৎ ফতোয়া] লেখেন।

আলহামদু লিল্লাহ্ ফতোয়াটি আহক্বারের হাতে [অর্থাৎ মুফতী শফী (রহ.) এর হাতে] পৌঁছেছে। 'আল-মুফতী' পত্রিকা সেটি প্রকাশ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে।

(নোট):

মূল ফতোয়াটি ফার্সী ভাষায় [লিখিত]। বিশিষ্ট-সাধারণ সকলের ফায়েদার প্রতি খেয়াল করে আহক্বার [অর্থাৎ মুফতী শফী (রহ.)] মূল ফতোয়াটি হুবহু বহাল রেখে সাথে তার উর্দু তরজমা লিখে দিয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা মূল ফতোয়ার মতো একেও [অর্থাৎ উর্দু তরজমাকেও] মকবূল ও মুফীদ [উপকারী] বানান। আমীন!

হযরত [গাঙ্গুহী (রহ.)] মূল ফতোয়ার কোন নাম দেননি। সহজতার জন্য আহক্বার এর নাম রেখেছে-

)فيصلة الأعلام في دار الحرب و دار الإسلام

[দারুল হরব এবং দারুল ইসলামের ব্যাপারে মহামনীষীগণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত]

না কারায়ে খালায়েক্বঃ বান্দা মুহাম্মদ শফী

২৯রবিউস সানী, ১৩৫২হি. [মোতাবেক ১৯৩৩ইং.]

[মূল ফতোয়া]

(হিন্দুস্তান কি দারুল হরব ?)

(সওয়ালঃ)

হজরত ওলামায়ে কেরাম এবং মুফতিয়ানে ইসলামের খেদমতে আরজ এই যে, শরীয়তের অনেক আহকাম দারুল ইসলাম এবং দারুল হরবের ভিন্নতার উপর নির্ভরশীল যা হযরত ওলামায়ে কেরামের নিকট অস্পষ্ট নয়।

অতএব, বর্তমান যুগের ওলামায়ে কেরাম এই মাসআলাতে কী বলেন যে, হিন্দুস্তান যা আজ সকল দিক থেকে নাসারাদের দখলদারিত্ব এবং হুকুমতের অধীন, শরীয়তের দৃষ্টিতে তাকে দারুল হরব বলা হবে নাকি দারুল ইসলাম?

(জওয়াবঃ)

প্রথমে এ কথা জেনে নেয়া চাই যে, কোন রাষ্ট্র বা কোন শহর দারুল ইসলাম বা দারুল হরব হওয়ার ভিত্তি হচ্ছে, তার উপর বিজয় কি মুসলমানদের না কাফেরদের।

এ হিসেবে যে শহর মুসলমানদের হুকুমতের অধীনে তা দারুল ইসলাম।

'জামিউর রুমুজ' এ আছে-

"دار الإسلام ما يجري فيه حكم إمام المسلمين وكانوا فيه آمنين، ودار الحرب ما خافوا فيه من الكافرين." انتهى

"দারুল ইসলাম ঐ রাষ্ট্র যাতে মুসলমানদের ইমামের হুকুম চলে এবং মুসলমানরা সেখানে নিরাপদ। আর দারুল হরব হচ্ছে ঐ রাষ্ট্র যেখানে মুসলমানরা কাফেরদের থেকে তাদের তাদের জান ও মালের উপর আশংকায় থাকে।"

'দুররে মুখতার'[১] এ আছে

"سئل قارئ الهداية عن البحر الملح : أ من دار الحرب أو الإسلام ؟ أجاب : أنه ليس من أحد القبيلين، لأنه لا قهر لأحد عليه." انتهى

"ক্বারিউল হিদায়াকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'সমুদ্র দারুল হরবেরঅন্তর্ভূক্ত না'কি দারুল ইসলামের অন্তর্ভূক্ত'?

তিনি জওয়াব দেন, 'তা[অর্থাৎ সমূদ্র] উভয়ের কোনটারই অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা এর উপর কারোই পরিপূর্ণ দখলদারিত্ব নেই।' "

এই ইবারত [বক্তব্য] আনার দ্বারা আমার উদ্দেশ্য [এ কথা বুঝানো যে], কোন রাষ্ট্র দারুল ইসলাম বা দারুল হরব হওয়ার একমাত্র ভিত্তি ইসলাম বা কুফরের বিজয়ের উপর। যদিও সমুদ্রের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য মত হচ্ছে,তা দারুল হরবের অন্তর্ভূক্ত।

কিন্তু ঐ ভূমি যা কাফের ও মুসলমান উভয়ের সমান দখলদারিত্বে রয়েছে তাকে দারুল ইসলামই বলা হবে। কেননা প্রসিদ্ধ মূলনীতি-

"الإسلام يَعلو، ولا يُعلى"

"(ইসলাম বিজয়ী থাকে পরাজিত হয় না)" এর দাবী এটাই।

তবে উক্ত ভূমিকে [অর্থাৎ যা কাফের ও মুসলমান উভয়ের সমান দখলদারিত্বে রয়েছে] দারুল ইসলাম এ শর্ত সাপেক্ষে বলা হবে যে, তাতে কোন ইসলামী শাসকের কব্জা এবং দখলদারিত্ব রয়েছে।

নতুবা উক্ত রাষ্ট্রকে কেবল এ হিসেবেই দারুল ইসলাম বলে দেয়া হবে না যে, তাতে মুসলমানরা বসবাস করে কিংবা কাফেরদের অনুমতিক্রমে শাআয়েরে দ্বীন পালন করতে পারে।

কোন [কাফের রাষ্ট্র দারুল ইসলাম গণ্য হওয়ার ক্ষেত্রে উক্ত] রাষ্ট্রে শুধু মুসলমানদের বসবাস করতে পারা কিংবা কাফেরদের অনুমতিক্রমে শাআয়েরে দ্বীন পালন করতে পারার কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই।

তদ্রূপ [ইসলামী শাসনাধীন] কোন রাষ্ট্রে কাফেরদের বসবাস করা কিংবা মুসলমানদের অনুমতিক্রমে বা তাদের গাফলতির সুযোগে সেখানে শাআয়েরে কুফর যাহের করার কারণে তা দারুল ইসলাম হওয়ার মাঝে কোন বাধা সৃষ্টি করবে না।

কেননা এ উভয় ক্ষেত্রেই বিজয় ঐ সব লোকের নয়। আর[দারুল ইসলাম বা দারুল হরব হওয়ার] ভিত্তি তো হচ্ছে বিজয়ের উপর। শুধু বসবাস বা [শাআয়েরে দ্বীন] যাহের করার উপর নয়।

এ কারণেই তো যিম্মী কাফেররা মুসলমানদের অনুমতিক্রমে দারুল ইসলামে বসবাস করে এবং তাদের শাআয়েরগুলো পালনও করে। কিন্তু দারুল ইসলাম তার আপন অবস্থায় দারুল ইসলামই থেকে যায়।

তদ্রূপ মুসলমানরা দারুল কুফরে যায় এবং তাদের শাআয়েরগুলো পালনও করে। কিন্তু শুধু এতটুকুর কারণে ঐ রাষ্ট্র দারুল হরব হওয়া থেকে বের হয়ে যায় না।

তোমরা কি দেখ না – মক্কা বিজয়ের পূর্বে যখন মক্কা মুকাররামা দারুল হরব ছিল তখন ফখরে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমরাতুল ক্বাজার সময় এক বিশাল বাহিনী সহ মক্কা মুয়াজ্জমায় উপস্থিত হয়ে ছিলেন।

জামায়াত, নামাজ, উমরা ও অন্যান্য শাআয়ের ঘোষণা দিয়ে পালন করেছিলেন। তাঁর সাথে এমন বিশাল বাহিনী ছিল যে, কাফেরদেরকে পরাজিত-পরাভূত করতে পারতেন। কেননা উমরাতুল ক্বাজার পূর্বে হুদায়বিয়ার সময় ঐ পরিমাণ বাহিনী নিয়ে মক্কা মুয়াজ্জামার উপর চড়াও হওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। কিন্তু খোঁজ-খবর নেয়ার পর যখন হযরত উসমান (রা.) এর হত্যার ঘটনা মিথ্যা প্রমাণিত হলো তখন উক্ত প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করা হয়।

মোট কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এমন বিশাল বাহিনী ছিল যে, তিনি কাফেরদেরকে পরাজিত-পরাভূত করতে পারতেন। কিন্তু মক্কায় প্রবেশ এবং শাআয়ের আদায় যেহেতু কাফেরদের অনুমতিক্রমে হয়েছিল এ কারণে মক্কা মুয়াজ্জমাকে উক্ত তিন দিনের জন্য দারুল ইসলাম গণ্য করা হয়নি বরং পূর্বের মতো দারুল হরব হিসেবেই বহাল ছিল। কেননা মক্কায় প্রবেশ এবং ইসলাম যাহের করা [কাফেরদের] অনুমতির ভিত্তিতে ছিল, বিজয়ের ভিত্তিতে ছিলনা।

সারকথা, এ ব্যাপারে মূলনীতি হলোঃ

দারুল হরব ঐ ভূখন্ড যা কাফেরদের আয়ত্বাধীন। আর দারুল ইসালাম ঐ ভূখন্ড যা মুসলমানদের আয়ত্বাধীন। যদিও এক দারে অন্য দারের লোক দখলদারিত্ব এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি ব্যতীত বসবাস করে।

যেমন- দারুল ইসালামে কাফের এবং দারুল হারবে মুসলমানরা দখলদারিত্ব এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি ব্যতীত বসবাস করে।

আর যে রাষ্ট্রে মুসলমান-কাফের উভয়েরই দখলদারিত্ব রয়েছে তাকেও দারুল ইসালাম বলেই গণ্য করা হবে।

এই উসূল ও মূলনীতিকে খুব ভালভাবে আত্নস্থ করে নেয়া চাই। কেননা এ সংক্রান্ত [অর্থাৎ দারুল ইসলাম ও দারুল হরব সংক্রান্ত] সকল মাসআলা এ উসূল থেকেই বের হয় এবং এ অধ্যায়ের ফুরুয়ী তথা শাখা গত সকল বিধান এ মূলনীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত।

(মুসলমানদের দারুল হরব বিজয়)

এর পর আরেকটি মাসআলা শুনে রাখা চাই।তা হচ্ছে-

যে রাষ্ট্র মূলত দারুল হরব এবং দারুল কুফর ছিল এরপর মুসলমানরা তা বিজয় করে এবং ইসলামের হুকুম আহকাম তাতে জারি করে এর ব্যাপারে ওলামাগণ একমত যে, তা এখন দারুল ইসলাম হয়ে গেছে।

কেননা এর উপর মুসলমানদের বিজয় এবং প্রভাব প্রতিপত্তি কায়েম হয়েছে। যদি কোন দিক থেকে কাফেরদের প্রভাব কিছুটা বাকি থেকেও থাকে তবুও " **الإسلام يَعلو، ولا يُعلى**"(ইসলাম বিজয়ী থাকে ,পরাজিত হয়না) এই মূলনীতি হিসেবে তা সকলের ঐক্যমতে দারুল ইসলাম হয়ে গেছে, যেমনটা একটু পূর্বে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

এর পর এ বিষয়টিও স্পষ্ট করে দেয়া চাই যে, যদি ঐ [কাফের] রাষ্ট্রে মুসলমানদের প্রবেশ এবং ইসলামী আহকাম জারি করা উক্ত রাষ্ট্র বিজয় করার দ্বারা না হয়, তাহলে ঐ রাষ্ট্র দারুল হরব হওয়ার ব্যাপারে কোনই তফাৎ সৃষ্টি হবে না। অন্যথায় জার্মানী, রাশিয়া, ফ্রান্স, চীন এবং অন্যান্য রাষ্ট্র যা নাসারা কিংবা ভূতপূঁজারীদের দখলে আছে সবগুলোই দারুল ইসলাম বলার উপযুক্ত হয়ে যেত।

সারা দুনিয়ার কোথাও দারুল হরবের কোন নাম নিশানাই থাকতোনা। কেননা সব কাফের রাষ্ট্রেই মুসলমানরা কাফেরদের অনুমতিক্রমে ইসলামী হুকুম আহকাম পালন করছে। আর এ তো সুস্পষ্ট যে, বর্তমান হালতে সমগ্র দুনিয়াকে দারুল ইসলাম বলে দেয়া সম্পূর্ণই বাতিল।

(দারুল ইসলামের উপর কাফেরদের কব্জাঃ)

যে রাষ্ট্র বা শহর দারুল ইসলাম ছিল অতঃপর কাফেররা তা দখল করে নেয়- যদি তার উপর থেকে মুসলমানদের দখলদারিত্ব সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তা এখন দারুল হরবের হুকুমে চলে যাবে।

আর যদি এমন হয় যে, কাফেরদের দখলদারিত্ব তো কায়েম হয়েছে কিন্তু কোন কোন দিক থেকে ইসলামের দখলদারিত্বও বাকি রয়েছে তাহলে তাকে এখনোও দারুল ইসলামই বলা হবে। দারুল হরব বলা হবে না। এতটুকু কথার মধ্যে সকল ইমাম একমত।

তবে এ ব্যাপারে মতভেদ আছে যে, ইসলামের দখল দারিত্ব সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যাওয়ার সীমা কী?

সাহেবাইন অর্থাৎ ইমাম আবু ইউসূফ (রহ.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বলেন, যখন কাফেররা প্রকাশ্যে কুফরী বিধান জারি করে দেয় এবং মুসলমানরা কাফেরদের অনুমতি ব্যতীত নিজস্ব শক্তি বলে ইসলামী আহকাম জারি করতে না পারে তখন ইসলামের দখলদারিত্ব সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যায় এবং উক্ত রাষ্ট্র দারুল হরবের হুকুমে চলে যায়।

তবে হ্যাঁ, যদি মুসলমান কাফের উভয়ই তাদের আপন আপন শক্তি বলে নিজেদের আহকাম জারি করতে পারে তাহলে এখনো উক্ত রাষ্ট্র থেকে ইসলামের দখলদারিত্ব শেষ হয়ে যায়নি এবং উক্ত রাষ্ট্রকে দারুল হরবও বলা যাবে না।

আর যখন কাফেররা নিজস্ব শক্তি বলে প্রকাশ্যে তাদের বিধান জারি করে এবং মুসলমানরা কাফেরদের অনুমতি ব্যতীত প্রকাশ্যে তাদের আহকাম জারি করার সামর্থ্য না রাখে তাহলে তার উপর থেকে ইসলামের দখলদারিত্ব সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেছে।
কিয়াসের দাবি এটাই যা সাহেবাইন (রহ.) বলেছেন।

কেননা যখন কাফেররা এই পরিমাণ দখলদারিত্ব কায়েম করে ফেলল যে, কুফরী বিধান নিজস্ব শক্তি বলে জারি করতে পারছে, আর মুসলমানরা এই পরিমাণ অক্ষম ও পরাজিত হল যে, নিজেদের [ইসলামী] আহকাম জারি করতে পারছেনা এবং যে কুফরী বিধান মুসলমানদের জন্য লজ্জা ও অপমানের বিষয় তা দূর করতে

পারছেনা, তখন আর ইসলামের কী বাকি আছে যার কারণে ঐ রাষ্ট্রকে দারুল ইসলাম বলা যায় ?

বরং ঐ সূরতে কাফেরদের দখলদারিত্ব সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং বাস্তবিকই ঐ রাষ্ট্র দারুল হারবে পরিণত হয়েছে।

কিন্তু আবু হানিফা (রহ.) তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টির ভিত্তিতে ইসতিহসান[২] স্বরূপ বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের বিজয়ের একটা নিদর্শনও পাওয়া যাবে, কিংবা কাফেরদের দখলদারিত্বে এমন কোন দুর্বলতা অনুভূত হবে যার কারণে কাফেরদেরকে হটিয়ে দেয়া মুসলমানদের জন্য কোন মুশকিল বিষয় হবেনা ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ রাষ্ট্র দারুল হরব হয়ে গেছে বলে হুকুম না লাগানো চাই।

এ কারণেই আবু হানিফা (রহ.) [কাফেরদের দখলকৃত] উক্ত [ইসলামী] রাষ্ট্র দারুল হরব হওয়ার জন্য অতিরিক্ত দু'টি শর্ত আরোপ করেন।

প্রথম শর্তঃ

যে দারুল ইসলাম কাফেররা দখল করে নিয়েছে তা দারুল হরবেরসাথে মিলিত হতে হবে। দারুল হরব এবং তার মাঝখানে দারুল ইসলামের কোন রাষ্ট্র বা শহর বিদ্যমান না থাকতে হবে। কেননা এ ভাবে দারুল হরবেরসাথে মিলিত হওয়া এবং দারুল ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে স্পষ্টতই তা পূর্ণরূপে কাফেরদের কব্জায় চলে গেছে। তাদের হাত থেকে একে মুক্ত করা মুশকিল হয়ে পড়েছে।

এই মাসআলার দৃষ্টান্ত হচ্ছে –

কাফেররা মুসলমানদের মাল [ছিনিয়ে] নিয়ে গেলে তার দুই অবস্থাঃ

এক) তাদের দেশে নিয়ে গিয়ে পরিপূর্ণ কব্জা করে ফেলা।

এ সূরতে উক্ত মাল তাদের মালিকানাধীন [হয়ে গেছে বলে] ধরা হবে।

দুই) এখনো তাদের নিজেদের দেশে নিয়ে যেতে পারেনি এবং এর উপর তাদের পরিপূর্ণ কব্জা কায়েম করতে পারেনি।

এ অবস্থায় উক্ত মাল তার মালিকের মালিকানা থেকে বের হয়নি এবং কাফেরদের মালিকানায় প্রবেশ করেনি।

এই মাসআলা ফিকহের সমস্ত কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।

‘হিদায়া’(২/৫৮১) তে আছে-

“وإذا غلبوا على أموالنا و أحرزوها بدارهم ملكوها...الخ”

“যদি কাফেররা আমাদের মাল দখল করে তাদের দেশে নিয়ে যায় তাহলে তারা এর মালিক হয়ে যাবে।”

‘হিদায়া’(২/৫৮১) তে আরো আছে-

غير أن الاستيلاء لا يتحقق إلا بالإحراز بالدار، لأنه عبارة عن الاقتدار على المحل حالًا و مآلًا...الخ

“যতক্ষণ পর্যন্ত কাফেররা [আমাদের থেকে দখলকৃত] মাল তাদের দেশে না নিয়ে যেতে পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাতে তাদের কব্জা কায়েম হবে না।

কেননা [কোন বস্তুর উপর] কব্জা [লাভের অর্থ] হচ্ছে বর্তমানেও [উক্ত] বস্তুর উপর [ইচ্ছা মত হস্তক্ষেপের] সামর্থ্য থাকা এবং বাহ্যিক অবস্থাদৃষ্টে ভবিষ্যতেও তা বহাল থাকবে বলে মনে হওয়া।”

তদ্রুপ কাফেররা যদি [মুসলমানদের] কোন ভূমি বা শহর তাদের দেশে নিয়ে গিয়ে তার উপর পরিপূর্ণ কব্জা কায়েম করে ফেলে তাহলে উক্ত ভূখন্ড পরিপূর্ণরূপে কাফেরদের দখলে চলে গেছে [বলে ধরা হবে]।

আর ভূমি তাদের দেশে নিয়ে যাওয়ার সূরত তো এটাই হতে পারে যে, তা দারুল হরবের সাথে মিলিত হবে এবং দারুল ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন হবে।

আর যতক্ষণ পর্যন্ত এমনটা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাতে মুসলমানদের কব্জা কায়েম রয়েছে বলে ধরা হবে।

এই কব্জা যদি দুর্বলও হয় তবুও **“الإسلام يَعلو، ولا يُعلى”** “(ইসলাম বিজয়ী থাকে , পরাজিত হয় না।)” এর দাবি এটাই যে , উক্ত ভূখন্ড দারুল ইসলাম হিসেবে বহাল থাকবে।

অতএব, এ শর্তের সারকথা এটাই দাঁড়ালো – কাফেরদের কব্জা এবং মুসলমানদের পরাজয়। যেমনটা শুরুতে মূলনীতি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় শর্তঃ

ইমামে আজমের নিকট দ্বিতীয় শর্তটি হচ্ছে, মুসলমান শাসক মুসলমানদেরকে ইসলামের কারণে এবং কাফের প্রজাদেরকে যিম্মি হওয়ার কারণে যে আমান [নিরাপত্তা] দিয়েছিলেন তা বাতিল হয়ে যাওয়া। কোন ব্যক্তি পূর্বোক্ত আমানের কারণে নিজের জান-মালের উপর নিরাপদ না থাকা।

অর্থাৎ 'মুসলমান শাসকের দেয়া আমানের কারণে সকলেই যেমন আশংকা মুক্ত ছিল, তাদের জান-মালের উপর কারো জুলুম করার সুযোগ ছিল না'- তেমন আর না থাকা।

আর এ তো সুস্পষ্ট যে, মুসলিম শাসকের শক্তি, দাপট ও প্রভাব-প্রতিপত্তি ব্যতীত এই পর্যায়ের আমান অর্জিত হওয়া সম্ভব নয়।

মোটকথা – উক্ত আমান আর বাকি না থাকা, বরং তা বেকার হয়ে যাওয়া। দখলদার কাফেরদের কতৃক তাদের কানূন অনুযায়ী প্রদত্ত আমানই নিরাপত্তার একমাত্র সম্বল হওয়া।

আর এ তো সুস্পষ্ট যে, মুসলিম শাসকের প্রদত্ত আমান দ্বারা যতদিন জালেমের জুলুমের ভয় বিদূরীত থাকবে, ততদিন পর্যন্ত মুসলিম শাসকের শক্তি ও দাপট বহাল রয়েছে বলে ধরা হবে। যখন এসব কিছু আর থাকছে না, বরং কাফেরদের প্রদত্ত আমানের উপরই কেবল নির্ভর করতে হচ্ছে তখন পূর্বের আমান বাতিল হয়ে গেছে।

সারকথাঃ

ইমামে আজমের নিকট প্রকাশ্যে কুফরী বিধান জারি করার সাথে সাথে যখন এ দুই শর্তও পাওয়া যাবে তখন সর্বদিক থেকে কাফেরদের দখলদারিত্ব কায়েম হয়েছে বলে ধরা হবে এবং মুসলমানদের শক্তি ও দাপট সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেছে বলে গণ্য হবে।

তখন অসহায় উক্ত ভূখন্ড দারুল হরব হয়ে গেছে বলে হুকুম দেয়া হবে।

বিবেকবানরা এ থেকেও বুঝতে পারছেন যে, এই [দ্বিতীয়] শর্তের ভিত্তিও শক্তি ও দখলদারিত্বের উপরই। শুরুতে মূলনীতির মধ্যে যা ব্যাখ্যা করে দেয়া হয়েছে।

এবার [দারুল ইসলাম-দারুল হরব সংক্রান্ত] ফুকাহায়ে কেরামের রিওয়ায়াত [বর্ণনা] এবং ইবারাত [বক্তব্য] সমূহ শোনা চাই। কেননা সেগুলোর কোন কোনটা থেকে বান্দার উপরোল্লিখিত আলোচনার দলীল পাওয়া যাবে এবং কোন কোনটা থেকে এই মাসআলা সংক্রান্ত রিওয়াত গুলোর হাকীকত [স্বরূপ] স্পষ্ট হয়ে যাবে।

'ফাতাওয়া আলমগীর'(২/২৪৮) তে আছে-

"قال محمد – رحمه الله تعالى – في الزيادات: إنما تصير دار الإسلام دار الحرب عند أبي حنيفة – رحمه الله تعالى – بشروط ثلاثة، أحدها: إجراء أحكام الكفار على سبيل الاشتهار، وأن لا يحكم فيها بحكم الإسلام، والثاني: أن تكون متصلة بدار الحرب ، لا يتخلل بينهما بلد من بلاد الإسلام، والثالث: أن لا يبقى فيها مؤمن ولا ذمي آمنا بأمانه الأول الذي كان ثابتا قبل استيلاء الكفار، للمسلم بإسلامه وللذمي بعقد الذمة، وصورة المسألة على ثلاثة أوجه

إما أن يغلب أهل الحرب على دار من دورنا، أو ارتد أهل مصر وغلبوا وأجروا أحكام الكفر، أو نقض أهل الذمة العهد وتغلبوا على دارهم، ففي كل من هذه الصور لا تصير دار حرب إلا بثلاثة شروط، وقال أبو يوسف ومحمد – رحمهما الله تعالى – بشرط واحد لا غير، وهو: إظهار أحكام الكفر، وهو القياس ."انتهى

"ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) 'আয-যিয়াদাত' নামক কিতাবে বলেন,

আবু হানিফা (রহ.) এর মতে [কোন] দারুল ইসলাম [কে কাফেররা দখল করে নিলে তা] দারুল হরব হবে কয়েকটি শর্তেঃ

এক) প্রকাশ্যে কুফরী বিধান জারি করা এবং ইসলামী আহকাম জারি না থাকা। দুই) উক্ত ভূখন্ড দারুল হরবের সাথে মিলিত থাকা। দারুল হরব এবং তার মাঝখানে দারুল ইসলামের কোন শহর বিদ্যমান না থাকা।

তিন) কাফেরদের দখলদারিত্বের পূর্বে মুসলমানদের জন্য তাদের ইসলামের কারণে এবং যিম্মি কাফেরদের তাদের যিম্মার চুক্তির মাধ্যমে যে আমান ছিল সেই আমানের বলে [এখন আর] কোন মুসলমান বা যিম্মি নিরাপদ না থাকা।

দারুল ইসলাম দারুল হরব হওয়ার সূরত তিনটিঃ

১. হারবী কাফেররা দারুল ইসলামের কোন ভূখন্ড দখল করে নেয়া।

২. কোন শহরের মুসলমানরা মুরতাদ হয়ে গিয়ে উক্ত শহর দখল করে নেয়া এবং তাতে কুফরী বিধান জারি করে দেয়া।

৩. যিম্মি কাফেররা তাদের যিম্মার চুক্তি ভঙ্গ করে তাদের বসবাসরত দারুল ইসলামের উক্ত ভূখন্ড দখল করে নেয়া।

এই তিন সূরতের কোন সূরতেই [আবু হানিফা (রহ.) এর মতে] [উপরোক্ত] তিন শর্ত ব্যতীত দারুল ইসলাম দারুল হরব হবে না।

কিন্তু আবু ইউসূফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং মুহাম্মাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর নিকট কেবল এক শর্ত পাওয়া গেলেই দারুল হরব হয়ে যাবে।

আর তা হচ্ছে- কুফরী বিধান জারি করা। আর কিয়াসের দাবি এটাই।"

'জামিউর রুমুজ' কিতাবে আছে-

فأما صيرورتها دار الحرب فعنده بشرائط،

أحدها : إجراء أحكام الكفر اشتهارًا، بأن يحكم الحاكم بحكمهم، ولا يرجعون إلى قضاة المسلمين، كما في البحر،

والثاني : اتصال بدار الحرب بحيث لا يكون بينهما بلدة من بلاد الإسلام ما يلحقهم المدد منها...الخ

"দারুল ইসলাম দারুল হরব হওয়া আবু হানিফা (রহ.) এর নিকট তিন শর্তের উপর মাওকূফঃ

এক) প্রকাশ্যে কুফরী বিধান জারি করা। অর্থাৎ বিচারকরা কুফরী বিধান দিয়ে বিচার ফায়সালা করা। মুসলমান বিচারক [যারা ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী ফায়সালা

করেন] তাদের নিকট যাওয়া লোকজনের জন্য সম্ভব না হওয়া। যেমনটা 'আল-বাহরুর রায়েক্ব' এ বলা হয়েছে।

দুই) উক্ত ভূখন্ড দারুল হরবেরসাথে এমন ভাবে মিলিত থাকা যে, মাঝখানে দারুল ইসলামের কোন শহর প্রতিবন্ধক নেই যেখান থেকে [দখলদার কাফেরদেরকে হটানোর জন্য] ঐ ভূখন্ডের মুসলমানদের কাছে সাহায্য পৌঁছতে পারে।"

জামিউর রুমুজের উক্ত রিওয়ায়াত থেকে দুটি বিষয় বুঝা গেলঃ

এক) ইসলামী আহকাম জারি করার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আপন শক্তিও দাপটের সাথে জারি করা। কাফেরদের অনুমতিক্রমে কোন মতে জামাআত সহ নামাজ ও জুমআ আদায় করতে পারা উদ্দেশ্য নয়।

কেননা জামিউর রুমুজের ইবারতে বলা হয়েছে-

"يحكم بحكمهم، ولا يرجعون إلى قضاة المسلمين".

"কাফেরদের বিধান দ্বারা বিচার ফায়সালা করা হয়। লোকজন মুসলিম বিচারক [যারা শরীয়ত অনুযায়ী ফায়সালা করেন] তাদের নিকট যাওয়ার সামর্থ্য রাখেনা।"

অর্থাৎ মুসলিম বিচারকদের কোন প্রকার শক্তি ও প্রভাব বাকি নেই যে, লোকজন তাদের নিকট বিচার নিয়ে যেতে পারে।

এমনি ভাবে দারুল হারবে মুসলমানদের ইসলামী আহকাম জারি করা কেবল ঐ সূরতেই তাকে দারুল ইসলাম বানাতে পারে যখন এই আহকাম জারি মুসলমানদের নিজস্ব শক্তি ও দাপটে হয়।

এ বিষয়টি একেবারেই সুস্পষ্ট।

মোটকথা ইসলামী আহকাম জারি বা কুফরী বিধান জারি প্রত্যেকটাই নিজস্ব শক্তি ও দাপটে হলেই কেবল গ্রহণ যোগ্য হবে। শুধু প্রকাশ্যে আদায় করতে পারলেই গ্রহণ যোগ্য হয়ে যাবে না।

[দুই)] দ্বিতীয় যে বিষয়টি জামিউর রুমুজের ইবারত থেকে বুঝা যাচ্ছে তা হলো-

দারুল হরবের সাথে মিলিত থাকার যে শর্ত আবু হানিফা (রহ.) এর নিকট জরুরী

তার দ্বারাও ঐ শক্তিও দাপটই উদ্দেশ্য। কেননা দারুল হরবের সাথে মিলিত থাকার সূরতে সেখানে মুসলমানদের সাহায্য পৌঁছতে পারবে না।

পক্ষান্তরে দারুল হরব থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার সূরতে মুসলমানদের জন্য তাকে মুক্ত করতে পারার সম্ভাবনা প্রকট। একারণেই ইসলামের শক্তি বহাল রয়েছে বলে ধরা হবে।

'খিযানাতুল মুফতীন' কিতাবে আছে-

دار الإسلام لا تصير دار الحرب إلا بإجراء أحكام الشرك فيها، وأن تكون متصلة بدار الحرب، لايكون بينها وبين دار الحرب مصر للمسلمين، وأن لا يبقى فيها مسلم أو ذمي آمنًا بالأمان الأول، وأن لا يبقى فيها مسلم أو ذمي آمنًا على نفسه إلا بأمان المشركين

"[কাফেররা] কোন দারুল ইসলাম [কে দখল করে নিলেও] ততক্ষণ পর্যন্ত [তা] দারুল হরব হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না –

– তাতে প্রকাশ্যে কুফরী বিধান জারি করা হয়।

– উক্ত ভূখন্ড দারুল হরবের সাথে মিলিত হয়। দারুল হরব এবং তার মাঝখানে মুসলমানদের কোন শহর প্রতিবন্ধক না থাকে।

– কোন মুসলমান ও যিম্মি তার পূর্বের আমানের বলে নিরাপদ না থাকে। কাফেরদের প্রদত্ত আমান ব্যতীত কোন মুসলমান বা যিম্মি নিজের ব্যাপারে আশংকা মুক্ত না থাকে।"

'ফাতাওয়া বাযযাযিয়্যা'(৩/১৭১) তে আছে-

"قال السيد الإمام : والبلاد التي في أيدي الكفرة اليوم لا شك أنها بلاد الإسلام بعدُ، لأنه لم يظهر فيها أحكام الكفر، بل القضاة المسلمون".

"সায়্যিদ ইমাম (রহ.) বলেন- বর্তমানে যেসব রাষ্ট্র কাফেরদের কব্জায় আছে নিঃসন্দেহে এখন পর্যন্ত সেগুলো দারুল ইসলামই রয়ে গেছে। কেননা সেগুলোতে কুফরী বিধান চালু হয়নি। বরং সেখানকার শাসক এবং বিচারকগণ মুসলমান।"

দেখা উচিৎ- [কাফেরদের দখলকৃত] ঐ রাষ্ট্রগুলো দারুল ইসলাম হিসেবে বাকি থাকার দলীল এই দেয়া হয়েছে যে, 'সেখানকার শাসক এবং বিচারকগণ মুসলমান। সেখানে ইসলামী আহকাম আগের মতোই চালু রয়েছে।'

দলীলে একথা বলা হয়নি, লোকজন সেখানে নামাজ পড়ে, জুমআ আদায় করে। কেননা আহকাম জারি দ্বারা ঐ জারি উদ্দেশ্য যা ক্ষমতা এবং শক্তি বলে হয়।

কাফের শাসকের সম্মতি ও অনুমতিক্রমে দ্বীনের বিধি-বিধান ও শাআয়ের আদায় করতে পারা উদ্দেশ্য নয়।

'রদ্দুল মুহতার' (২/১৪৪) এ আছে-

في معراج الدراية عن المبسوط : البلاد التي في أيدي الكفار بلاد الإسلام لا بلاد الحرب ، لأنهم لم يظهروا فيها حكم الكفر بل القضاة والولاة مسلمون، يطيعونهم عن ضرورة أو بدونها، وكل مصر فيه والٍ من جهتهم يجوز له إقامة الجمع والأعياد والحد وتقليد القضاة لاستيلاء المسلم عليهم، فلو الولاة كفارا يجوز للمسلمين إقامة الجمعة ، ويصير القاضي قاضيا بتراضي المسلمين ، ويجب عليهم أن يلتمسوا واليا مسلما

"'মি'রাজুদ দিরায়া' তে মাবসূত থেকে বর্ণিত আছে- [বর্তমানে] যেসব ভূখন্ড কাফেরদের কব্জায় আছে সেগুলো দারুল ইসলাম, দারুল কুফর নয়। কেননা তারা ঐ সব ভূখন্ডে কুফরী বিধান জারি করেনি। বরং সেখানকার শাসকও বিচারকগণ মুসলমান। তারা [অর্থাৎ সেখানকার মুসলমান শাসক ও বিচারকগণ] জরুরত বশত বা জরুরত ছাড়াই তাদের [অর্থাৎকাফেরদের] আনুগত্য করে।

আর প্রত্যেক ঐ শহর যাতে তাদের [মুসলমানদের] পক্ষ থেকে নিযুক্ত গভর্নর রয়েছে তার [গভর্নরের] জন্য জুমআ, ঈদ ও হদ [তথা শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি] সমূহ কায়েম করা এবং কাজী [বিচারক] নিয়োগ দেয়া জায়েয। কেননা [এখানে] তাদের [মুসলমানদের] উপর ক্ষমতাও শাসন মুসলমান শাসকের।

আর যদি শাসকরা কাফের হয় তবুও মুসলমানদের জন্য [তাদের অধীনে] জুমআ, ঈদ কায়েম করা জায়েয।

আর মুসলমানদের পারস্পরিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতে [নির্বাচিত] কাজী [বিচারক] [শরীয়তের দৃষ্টিতেও] কাজী হয়ে যাবে।

দারুল হরবের মুসলমানদের উপর একজন মুসলমান শাসক তালাশ করা (এবং তার মাধ্যমে নিজেদের মুআমালা সমূহের বিচার ফায়সালা করানো) ওয়াজিব।" 'রদ্দুল মুহতার'(৪/১৭৫) এ আরো বলা হয়েছে-

قلت: وبهذا ظهر أن ما في الشام من جبل تيم الله ... وبعض البلاد التابعة كلُّها دار إسلام، لأنها وإن كانت لها حكام دروز أو نصارى، ولهم قضاة على دينهم ... لكنهم تحت حكم ولاة أمورنا، وبلاد الإسلام محيطة ببلادهم من كل جانب، وإذا أراد ولي الأمر تنفيذ أحكامنا فيهم نفذها." انتهى

"আমি বলি [অর্থাৎ আল্লামা শামী বলেন] [পূর্বোক্ত] এ [আলোচনা] থেকে বুঝে আসে যে, শামের 'তাইমুল্লাহ্' পাহাড় এবং এর অন্তর্গত আরো কতক শহর সবগুলোই দারুল ইসলাম।

কেননা সেগুলোর শাসক যদিও দারুয বা নাসারা এবং তাদের নিজেদের ধর্মীয় বিচারকও রয়েছে, কিন্তু তারা সকলেই আমাদের মুসলমান শাসকদের অধীনস্থ।

দারুল ইসলাম চতুর্দিক থেকে তাদের এলাকাকে বেষ্টন করে রেখেছে। মুসলমান শাসকগণ যখনই চাইবেন তাদের উপর আমাদের [শরীয়তের] আহকাম জারি করে দিতে পারবেন।"

এই দুই রিওয়ায়াত থেকে স্পষ্ট যে, কাফেররা কোন [ইসলামী শাসনাধীন] রাষ্ট্র দখল করে নেয়ার পর [তা] দারুল ইসলাম হিসেবে বাকি থাকার জন্য ইসলামী আহকাম জারি থাকার যে শর্ত, তার দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য যে, ক্ষমতা ও দাপটের সাথে ইসলামী আহকাম জারি করা যাচ্ছে।

তদ্রূপ দারুল হারবে ইসলামী আহকাম জারি করার দ্বারা তখনই তা দারুল হরব হওয়া থেকে বের হবে যখন এই আহকাম জারি করা ক্ষমতা ও দাপটের সাথে হবে। এই নয় যে, দারুল হরবের শাসক তার নিজ অনুমতিক্রমে ইসলামী আহকাম জারি করে দেয়।

সারকথাঃ

ইমামে আজম (রহ.) এর উপরোক্ত তিন শর্ত এবং সাহেবাইন (রহ.) এর এক শর্তের দ্বারা উদ্দেশ্য একটাই। অর্থাৎ ক্ষমতা ও দাপট। যদিও তা কোন কোন দিক থেকে হয় [সর্বদিক থেকে না হয়।]

কিন্তু ওলামায়ে ইসলামের কেউই একথা বলেন না যে- 'কোন ব্যক্তি যদি কাফের রাষ্ট্রে কাফেরদের সুস্পষ্ট অনুমতিতে বা তাদের উদাসীনতার কারণে শাআয়েরে ইসলাম প্রকাশ্যে পালন করে তাহলে উক্ত রাষ্ট্র দারুল ইসলাম হয়ে যাবে।'

আল্লাহর পানাহ্! [কিছুতেই তারা এমন কথা বলতে পারেন না।] কেননা এধরণের খেয়াল তাফাক্কুহ্ [তথা দ্বীনের সমঝ ও বুঝ] থেকে সম্পূর্ণ দূরে।

***

(হিন্দুস্তানের হালতঃ)

যখন মূলনীতি গত দিক থেকে এই মাসআলার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হলো তখন হিন্দুস্তানের হালতের ব্যাপারে নিজেই ফিকির করে দেখ [কোন দারুল ইসলাম দারুল হরব হওয়ার জন্য যেসব শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে এখানে সেগুলো কত জোরালো ভাবেই না পাওয়া যাচ্ছে।]

[প্রথম শর্ত কীভাবে পাওয়া যাচ্ছে দেখ] এখানে নাসারা কাফেরদের বিধান কী পরিমাণ শক্তি এবং দাপটের সাথে চলছে !! যদি সাধারণ কোন কালেক্টরও হুকুম জারি করে যে, 'মসজিদে জামাত করতে পারবেনা' তাহলে বিশিষ্ট-সাধারণ কারোই এ সামর্থ্য নেই যে, জামাত আদায় করবে।

আর জুমআ, ঈদ এবং শরীয়তের আরো কিছু বুনিয়াদী বিষয়ের উপর আমল যা এখানে হচ্ছে তা কেবল তাদের এই আইনের কারণে যে, 'প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজ ধর্মের ব্যাপারে স্বাধীন। এ ব্যাপারে কারো হস্তক্ষেপ করার অধিকারণেই'। [দ্বিতীয় শর্ত কীভাবে পাওয়া যাচ্ছে দেখ] মুসলিম শাসকগণ প্রদত্ত যে আমান এখানকার বাসিন্দাদের ছিল এখন তার কোন নাম নিশানাও নেই। কোন বিবেকবান বলতে পারবে, বাদশাহ শাহ আলম যে আমান আমাদেরকে দিয়েছিলেন আমরা সেই আমানের দ্বারা আজও নিরাপত্তার সাথে বসে আছি ?!

বরং কাফেরদের থেকে নতুন আমান নেয়া হয়েছে। নাসারাদের দেয়া এ আমানের মাধ্যমেই হিন্দুস্তানের সকল প্রজা এখানে বসবাস করছে।

আর [তৃতীয় শর্ত অর্থাৎ 'দারুল হরবের সাথে মিলিত থাকা'এর ব্যাপারে কথা হচ্ছে] দারুল হরবের সাথে মিলিত থাকা বড় বড় এলাকার জন্য শর্ত নয়। গ্রাম, শহর এবং এমন [ছোট] এলাকার জন্য শর্ত। যার উদ্দেশ্য কেবল এতটুকু যে, ওখানে [দারুল ইসলাম থেকে] সাহায্য পৌঁছা সহজ।

যদি কেউ বলে, 'রোম [অর্থাৎ তুরস্ক] বা কাবুলের [অর্থাৎ আফগানিস্তানের] শাসকের পক্ষ থেকে সাহায্য আসলে কাফেরদেরকে হিন্দুস্তান থেকে হটানো সম্ভব' তাহলে আল্লাহর পানাহ্! এ ধরণের মন্তব্য কোনক্রমেই সঠিক নয়। হিন্দুস্তান থেকে তাদেরকে হটানো অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। অনেক বড় জিহাদ এবং বিশাল যুদ্ধ সামগ্রীর প্রয়োজন।

মোট কথা হিন্দুস্তানে কাফেরদের দখলদারিত্ব এই পরিমাণ কায়েম হয়েছে যে, কোন সময় কোন দারুল হরবে কাফেরদের এর চেয়ে বেশী দখলদারিত্ব হয় না।

আর ইসালামী শাআয়ের যা এখানে মুসলমানরা পালন করছে তা কেবল তাদের [কাফেরদের] অনুমতিক্রমে হচ্ছে। নতুবা মুসলমানদের চেয়ে অসহায় নাগরিক কেউ নেই। হুকুমতে হিন্দুদেরও তো কিছুটা প্রভাব আছে, কিন্তু মুসলমানদের তাও নেই।

তবে হ্যাঁ, টুংক, রামপুর, ভূপাল এবং অন্যান্য রাজ্য যেখানকার শাসকরা কাফেরদের দ্বারা পরাজিত হওয়া সত্বেও নিজেদের বিধি-বিধান [অর্থাৎ ইসলামী বিধি-বিধান] জারি রাখতে পারছেন সেগুলোকে দারুল ইসলাম বলা যেতে পারে। যেমনটা 'দুররে মুখতার' ও অন্যান্য কিতাবের রিওয়ায়াত থেকে বুঝা যাচ্ছে। **فقط والله سبحانه وتعالى أعلم.**

বান্দা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী।

[রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) এর ফতোয়া এখানে শেষ হয়েছে।]

[ফতোয়ার অনুবাদ শেষ করার পর মুফতী শফী (রহ.) বলেন] আল্লাহ তাআলার প্রশংসা যে, তাঁর ইহসানে 'দারুল হরব' রিসালাটির উর্দু তরজমা সম্পন্ন হলো।

আল্লাহ তাআলা মূল ফতোয়ার সাথে একেও [অর্থাৎ উর্দু তরজমাকেও] মাকবূল এবং নাফে' [অর্থাৎ উপকারী] বানান। আমীন!

والحمد لله الذي بعزته و جلاله تتم الصالحات.

বান্দা মুহাম্মদ শফী দেউবন্দী

আফাল্লাহু আনহু [আল্লাহ্ তাকে মাফ করুন]

বর্তমান মুসলিম রাষ্ট্রগুলো দারুল হরব কেন?

রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) যে অবস্থার প্রেক্ষিতে ইংরেজদের দখলে থাকা তৎকালীন হিন্দুস্তান তথা বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান সহ গোটা ভারতীয় উপমহাদেশকে দারুল হরব ফতোয়া দিয়েছিলেন, আজ মুসলিম নামধারী মুরতাদ শাসকদের দখলে থাকা মুসলিম রাষ্ট্র সমূহে হুবহু ঐ অবস্থা বরং তার চেয়ে আরোও নাজুক অবস্থা বিদ্যমান। অতএব, তৎকালীন হিন্দুস্তানের মতো বর্তমানে মুরতাদদের দখলে থাকা মুসলিম রাষ্ট্রসমূহও দারুল হরব।

রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) এর উক্ত ফতোয়াটি যদি বর্তমান মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের উপর প্রয়োগ করি তাহলে কোন বেশ কম ছাড়াই হুবহু তা এসব রাষ্ট্রের উপর ফিট হয়ে যাবে।

আসুন দেখি এসব মুসলিম রাষ্ট্রে ফতোয়াটি কিভাবে আরোপিত হয়- "বর্তমান মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর হালতঃ

যখন মূলনীতি গত দিক থেকে এই মাসআলার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হলো তখন বর্তমান মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর হালতের ব্যাপারে নিজেই ফিকির করে দেখ [কোন দারুল ইসলাম দারুল হরব হওয়ার জন্য যেসব শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে এখানে সেগুলো কত জোরালো ভাবেই না পাওয়া যাচ্ছে।]

[প্রথম শর্ত কীভাবে পাওয়া যাচ্ছে দেখুন] এখানে মুরতাদ কাফেরদের বিধান কী পরিমাণ শক্তি এবং দাপটের সাথে চলছে !!

যদি সরকারী দলের সাধারণ কোন নেতাও হুকুম জারি করে যে, 'মসজিদে জামাত করতে পারবেনা' তাহলে বিশিষ্ট-সাধারণ কারোই এ সামর্থ্য নেই যে, জামাত আদায় করবে।

আর জুমআ, ঈদ এবং শরীয়তের আরো কিছু বুনিয়াদী বিষয়ের উপর আমল যা এখানে হচ্ছে তা কেবল তাদের এই আইনের কারণে যে, 'প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজ ধর্মের ব্যাপারে স্বাধীন। এ ব্যাপারে কারো হস্তক্ষেপ করার অধিকারণেই'।

[দ্বিতীয় শর্ত কীভাবে পাওয়া যাচ্ছে দেখুন] মুসলিম শাসকগণ প্রদত্ত যে আমান এখানকার বাসিন্দাদের ছিল এখন তার কোন নাম নিশানাও নেই।

কোন বিবেকবান বলতে পারবে, উসমানী খলীফাগণ কিংবা অন্যান্য মুসলিম শাসকগণ যে আমান আমাদেরকে দিয়েছিলেন আমরা সেই আমানের দ্বারা আজও নিরাপত্তার সাথে বসে আছি ?!

বরং মুরতাদদের থেকে নতুন আমান নেয়া হয়েছে। মুরতাদদের দেয়া এ আমানের মাধ্যমেই বর্তমান মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সকল নাগরিক সেগুলোতে বসবাস করছে।

আর [তৃতীয় শর্ত অর্থাৎ 'দারুল হরবের সাথে মিলিত থাকা'এর ব্যাপারে কথা হচ্ছে] দারুল হরবের সাথে মিলিত থাকা বড় বড় এলাকার জন্য শর্ত নয়। গ্রাম, শহর এবং এমন [ছোট] এলাকার জন্য শর্ত। যার উদ্দেশ্য কেবল এতটুকু যে, ওখানে [দারুল ইসলাম থেকে] সাহায্য পৌঁছা সহজ।

যদি কেউ বলে, মোল্লা উমর এবং শায়খ উসামার পক্ষ থেকে সাহায্য আসলে মুরতাদদেরকে মুসলিম রাষ্ট্রগুলো থেকে হটানো সম্ভব' তাহলে আল্লাহর পানাহ্! এ ধরণের মন্তব্য কোনক্রমেই সঠিক নয়। মুসলিম রাষ্ট্রগুলো থেকে তাদেরকে হটানো অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। অনেক বড় জিহাদ এবং বিশাল যুদ্ধ সামগ্রীর প্রয়োজন।

মোট কথা বর্তমান মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে মুরতাদদের দখলদারিত্ব এই পরিমাণ কায়েম হয়েছে যে, কোন সময় কোন দারুল হরবে কাফেরদের এর চেয়ে বেশী দখলদারিত্ব হয় না।

আর ইসালামী শাআয়ের যা এখানে মুসলমানরা পালন করছে তা কেবল তাদের [মুরতাদদের] অনুমতিক্রমে হচ্ছে। নতুবা মুসলমানদের চেয়ে অসহায় নাগরিক

কেউ নেই। হুকুমতে শিয়া, হিন্দু, নাস্তিক ও অন্যান্য কাফেরদের তো অনেক প্রভাব আছে, কিন্তু মুসলমানদের কিছুই নেই।

তবে হ্যাঁ, আফগান, সোমালিয়া, ইয়ামান, শাম, ইরাক ও অন্যান্য ভূখন্ডের যেসব অংশ কাফেরদের থেকে উদ্ধার করে ইসলামী বিধি-বিধান জারি রাখা যাচ্ছে সেগুলোকে দারুল ইসলাম বলা যেতে পারে। যেমনটা 'দুররে মুখতার' ও অন্যান্য কিতাবের রিওয়ায়াত থেকে বুঝা যাচ্ছে। **فقط والله سبحانه وتعالى أعلم."**

[উল্লেখ্য যে, মোল্লা উমর (রহ.) এবং শায়খ উসামা (রহ.) এর ওফাত হয়ে গেছে। এখানে শুধু বুঝানোর উদ্দেশ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।**]**

আপনারা ভাল করে লক্ষ্য করে দেখুন গাঙ্গুহী (রহ.) এর ফতোয়াটি বর্তমান মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর উপর হুবহু আরোপিত হয় কি না ?

শুধু যে আরোপিত হয় তা-ই না, বরং বর্তমান মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর হালত তৎকালীন উপমহাদেশের চেয়ে আরো খারাপ।

তৎকালীন উপমহাদেশে তো কাফেররা দখল করে নেয়ার পরও এমন কিছু রাজ্য ছিল যেখানে শরয়ী শাসন জারি ছিল। তাছাড়া দুর্বল হলেও উসমানী খেলাফত তখনও কায়েম ছিল।

কিন্তু পরবর্তীতে কাফের ও মুরতাদরা মিলে মুসলিম রাষ্ট্র গুলোকে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেয়ার পর কোথাও ইসলামী শাসন জারি ছিল না। আফগানিস্তানে যাও কিছু ছিল পরপর আমেরিকা তাও শেষ করে দেয়।

আর বর্তমানে যে কয়টা ভূখন্ড মুজাহিদদের দখলে আছে তা কাফের ও মুরতাদদের বিরোদ্ধে দীর্ঘ দিনের যুদ্ধ এবং সমূদ্রসম রক্ত ঝরানোর ফসল। এছাড়া আর কোথাও ইসলামী শাসন কায়েম নেই। সর্বত্রই কুফরী শাসন চলছে।

বরং মুরতাদরা ইসলামকে মিটিয়ে দেয়ার জন্য আন্তর্জাতিক কুফরী শক্তির সাথে জোট গঠন করেছে। এক্ষেত্রে কাফের মুরতাদরা তাদের সবটুকু সামর্থ্য ব্যয় করছে। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, নাস্তিকতা অকল্পনীয় বেগে মুসলিম প্রজন্মকে কুফর, ইরতিদাদ ও ইলহাদের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

হয়তো অদূর ভবিষ্যতে এমন পরিস্থিতি দাঁড়াবে যে, মুসলিম দাবিদারদের অর্ধেক বা অধিকাংশই শরীয়তের দৃষ্টিতে ইসলামের গন্ডি থেকে বেরিয়ে গিয়ে মুরতাদ হয়ে পড়েছে। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক!

এমন ভয়াবহ কুফর এবং কুফরী শাসন বিরাজমান থাকা সত্বেও এসব রাষ্ট্রকে দারুল ইসলাম তথা ইসলামী রাষ্ট্র মনে করা শরীয়ত এবং বিবেকবুদ্ধির সম্পূর্ণ পরিপন্থি।
আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে সহীহ বুঝ দান করুন এবং সীরাতে মুসতাকীমের উপর কায়েম রাখুন। আমীন!

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد و على آله و أصحابه أجمعين

বান্দা আব্দুল ওয়াহহাব।

[১] [সম্ভবত 'দুররে মুখতার' না হয়ে 'রদ্দুল মুহতার' হবে । কেননা নিম্নোক্ত ইবারত 'রদ্দুল মুহতার'(৪/১৬০) এ পেয়েছি, 'দুররে মুখতার' এ পাইনি।] –

[২] উল্লেখ্য যে, ইসতিহসান বলা হয়ঃ যে মাসআলাতে একাধিক কিয়াসের সম্ভাবনা আছে সেখানে তুলনামূলক অধিক শক্তিশালী দলীলের ভিত্তিতে একটা কিয়াসকে তারজীহ তথা প্রাধান্য দেয়া।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১০৯০৯

শহীদী অভিযানের ব্যাপারে ইসলামের নীতি..

sifat

Member

১০-০১-২০১৮

কুরআন, সুন্নাহ এবং হক্কানী আলেম-ওলামাদের অনেক বক্তব্য থেকে শহীদী অভিযানের সমর্থন পাওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আর মানুষের মধ্যে এমন আছে যে নিজেকে বিক্রয় করে দেয়, আল্লাহর সন্তুষ্টির খোঁজে, আর আল্লাহ নিশ্চয়ই নিজের বান্দাদের ব্যাপারে পরিপূর্ণরূপে অনুগ্রহশীল।" [২:২০৭]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে কাসীর বলেনঃ "সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমদের মত যে এই আয়াতটি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী প্রতিটি মুজাহিদের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে ... আর যখন হিশাম ইবনু 'আমির শত্রুদলের মধ্যে ঝাপিয়ে পড়লেন, কিছু লোক এ ব্যাপারে আপত্তি করল। তখন উমার বিন খাত্তাব এবং আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন।" [তাফসীর ইবনে কাসীর ১/২১৬] হিশাম ইবনু 'আমির যখন শত্রুপক্ষের মধ্যে ঝাপ দিয়েছিলেন তখন এর ফলাফল সম্পর্কে পুরোপুরিই জানতেন যে প্রায় নিশ্চিতভাবেই তিনি নিহত হবেন, ঠিক যেমনটা শহীদী অভিযানে হয়ে থাকে। দেখা যাচ্ছে, উমার ইবনু খাত্তাব এবং আবূ হুরায়রাহ কাজটি সমর্থন করেছিলেন।

ইমাম মুসলিম তার সহীহ সনদে আবূ বাক্র বিন মূসা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেনঃ "আমি আবূ হুরায়রাহ্কে শত্রুর উপস্থিতিতে বলতে শুনেছি, "আল্লাহর রসূল (সঃ) বলেছেন, "জান্নাতের দরজা তরবারির ছায়াতলে!" তখন একজন শক্ত সমর্থ লোক উঠে দাঁড়াল এবং বলল, "হে আবূ মূসা! আপনি আল্লাহর রসূল (সঃ)-কে এই কথা বলতে শুনেছেন ?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ !" তখন লোকটি নিজের সাথীদের কাছে ফিরে গিয়ে বলল, "তোমাদের জন্য আমার পক্ষ থেকে সালাম।" তারপর নিজের তরবারির খাপটি ভেঙ্গে ফেলল এবং শত্রুর দিকে খোলা তরবারি নিয়ে এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকল।" বদরের যুদ্ধ সম্পর্কে ইমাম মুসলিমের একটি সহীহ হাদীস আছে, আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ "মুশরিকরা (এখন আমাদের দিকে) এগিয়ে আসল,

আর রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "উঠ এবং জান্নাতে প্রবেশ কর, যার প্রস্থ আসমান ও জমিনের সমান।" উমাইর বিন আল-হুমাম আল-আনসারী (রাঃ) বললেনঃ হে রসূলুল্লাহ (সঃ)! জান্নাত কি আসমান ও জমিনের সমান?" তিনি বললেনঃ "হ্যাঁ"। উমাইর বললেনঃ "ভাল, ভাল!" রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ " কিসে তোমাকে এই শব্দগুলো উচ্চারণ করতে উদ্বুদ্ধ করল? (অর্থাৎ "ভাল, ভাল !")" তিনি (উমাইর) বললেন, "হে রসূলুল্লাহ (সঃ)! অন্য কিছু নয় বরং এই ইচ্ছা যে, আমি যেন তার (জান্নাতের) অধিবাসীদের একজন হতে পারি।" তিনি (রসূলুল্লাহ (সঃ)) বললেনঃ "তুমি (নিশ্চয়ই) তাদের একজন।" এরপর উমাইর (রাঃ) নিজের থলি হতে কিছু খেজুর বের করে খেতে লাগলেন। এরপর বললেন, "যদি এই সবগুলি খেজুর খাওয়া পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকি তবে তা হবে একটি দীর্ঘ জীবন।" (বর্ণনাকারী বলেন): "সে তার সাথে যত খেজুর ছিল সব ফেলে দিল এবং শত্রুর সাথে যুদ্ধ করতে করতে নিহত হয়ে গেল।" উপরের দুটো বর্ণনাতেই, যে সাহাবারা আক্রমন পরিচালনা করেছেন, তারা প্রায় নিশ্চিতভাবেই জানতেন যে, অভিযানে তারা নিহত হবেন, কিন্তু তারা এরপরও আক্রমন পরিচালনা করেন এবং তাদের এই কাজগুলো শরীয়তে প্রশংসিত হয়েছে।

মুসতাদরাকে হাকিমে বর্ণিত হয়েছে, এক লোক রসূলুল্লাহ (সঃ) এর কাছে আসলেন এবং বললেনঃ "আপনি কি বলেন, যদি আমি নিজেকে মুশরিকদের মধ্যে নিক্ষেপ করি এবং মৃত্যু পর্যন্ত তাদের সাথে লড়তে থাকি? আমি কি জান্নাতে যাব?" তিনি (রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "হ্যাঁ।" অতঃপর লোকটি নিজেকে মুশরিকদের মধ্যে নিক্ষেপ করল এবং এবং লড়াই করতে করতে নিহত হয়ে গেল।

এই হাদীসটিও শহীদী অভিযানের পক্ষে একটি সুস্পষ্ট দলীল, যাতে শত্রুদলের ক্ষতি করার জন্যে নিজেকে তাদের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়।

ইমাম আহমাদ (রঃ) তার মুসনাদে আহমাদে, ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূল (সঃ) বলেছেন, "আমাদের রব্ব দু'জন ব্যক্তির ব্যাপারে বিস্মিত হনঃ একজন যে নিজের বিছানা ছাড়ে, নামাযের জন্য, আর একজন ব্যক্তি যে আল্লাহর রাস্তায় অভিযান চালায় এবং তার সঙ্গী-সাথীরা পরাস্ত হয়েছে, আর সে বুঝতে পারে পরাজয়ে তার জন্য কি অপেক্ষা করছে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে গেলে তার জন্য কি অপেক্ষা করছে – কিন্তু সে (যুদ্ধক্ষেত্রে) ফিরে যায় যতক্ষণ না

তার রক্ত প্রবাহিত হয় । আল্লাহ বলেনঃ "আমার বান্দাকে দেখ! সে (যুদ্ধে) ফিরে গেল, আমার কাছে যা আছে সে ব্যাপারে আশা ও ভয় রেখে, যতক্ষণ না তার রক্ত প্রবাহিত হল।"

যে ব্যক্তিটি যুদ্ধে ফিরে যায় সে সম্পূর্ণ নিশ্চিতভাবে জানে যে সে ফিরে গেলে নিহত হবে, কিন্তু আল্লাহ তার আমলকে স্বাগত জানান এবং কাজের প্রশংসা করেন।

মুয়া'জ ইবন 'আফরা (রাঃ) আল্লাহর রাসূলকে (সঃ) জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ "কি করলে আল্লাহ তার বান্দাদের ব্যাপারে হাসেন?" তিনি বললেন, "বান্দার নিজেকে বর্ম ব্যতিতই শত্রুদলের মধ্যে নিমগ্ন করা।" মুয়া'জ তখন নিজের বর্ম খুলে ফেললেন এবং নিহত হওয়া পর্যন্ত শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকেন। সুবহানাল্লাহ! যার ব্যাপারে আল্লাহ হাসেন তার মর্যাদা কোন স্তরে?

ইমাম কুরতুবী (রঃ) বলেছেনঃ "যখন মুসলিমদের সেনাদল পারস্যবাসীদের মুখোমুখি হল, তখন মুসলিমদের ঘোড়াগুলো পারস্যবাসীদের হাতীগুলো থেকে ভয়ে পলায়ন করছিল। মুসলিমদের একজন কাদা দিয়ে একটি হাতি তৈরি করেন এবং তার ঘোড়াকে এটার সাথে অভ্যস্ত করে তুললেন (যাতে নতুন একটি প্রাণী দেখে ঘোড়াটি ভয় পেয়ে না যায়)। পরের দিন, তার ঘোড়া হাতি থেকে পালাল না, তাই তিনি নেতৃত্বদানকারী হাতিটিকে আক্রমণ করলেন। তাকে বলা হয়েছিল, "এটা নিশ্চিতভাবেই তোমার মৃত্যুর কারণ হবে।" তিনি বলেছিলেন, "এতে দুঃখের কিছু নেই, যে আমি মারা যাব এবং মুসলিমরা বিজয়ী হবে।"

এবং উপরের উল্লেখিত ছাড়াও এর মত আরো অনেক হাদীস এবং ঘটনা বর্ণিত আছে। এতে করে এটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর জন্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করে নিশ্চিতজ্ঞানের সাথে যে এই আক্রমণ তার মৃত্যুর কারণ হবে ঠিক যেভাবে শহীদী অভিযানে করা হয়ে থাকে, এবং এতে ইসলাম এবং মুসলিমদের জন্যে উল্লেখযোগ্য রকমের উপকার থাকে, তাহলে শরীয়তে এটা বিশাল পুরষ্কারের যোগ্য হিসেবে গণ্য করা হয় । শহীদী অভিযান একটি নতুন কৌশল যা পূর্বযুগে সাহাবাদের নিজেকে শত্রুদলের মধ্যে নিক্ষেপ করার ন্যায়, যেখানে মৃত্যুর সম্ভাবনা নিশ্চিত। এখানে একমাত্র পার্থক্য হল যে শহীদী অভিযানে, একজন মুজাহিদ নিজেই নিজের মৃত্যুর কারণ, আর পূর্বে উল্লেখিত

ঘটনাগুলোতে মুজাহিদের মৃত্যুর কারণ শত্রু। কিন্তু আলেমরা উল্লেখ করেছেন যে, এই পার্থক্য ধর্তব্য নয়, কারণ এখানে নিয়্যত (আল্লাহর কালামকে উচ্চ করা) এবং শেষ ফলাফল (মৃত্যু) দু'টো ক্ষেত্রেই এক। আর নিয়্যতটাই হল মূলতঃ গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও, নিম্নের দলীল এ ব্যাপারে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত করেঃ আল্লাহর দীনকে সমুন্নত করার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করার সবচাইতে শক্তিশালী দলীল হল গুহার বালক এবং আসহাবে উখদূদের ঘটনাটি। ঘটনাটি সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থটিতে পূরো ঘটনাটি পাওয়া যাবে। আমাদের আলোচনার সাথে প্রাসঙ্গিক অংশটুকু আমরা এখানে উল্লেখ করব। ঘটনার সারাংশঃ পূর্বের জাতিগুলোর মধ্যে একটিতে, একজন রাজা এক বালককে তার ঈমান আনয়নের কারণে শাস্তি প্রদান করছিল। সে (রাজা) বালকটিকে বিভিন্ন উপায়ে মারার চেষ্টা করে, যেমন পাহাড়ের চূড়া থেকে ফেলে দেয়া বা সমুদ্রে ডুবিয়ে মারা ... কিন্তু বালকটি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়ে দু'আ করতে থাকে এবং বেঁচে যায়। বর্ণনা অনুযায়ী শেষ পর্যন্ত যা ঘটেঃ

"... সে (বালকটি) রাজাকে বললঃ "যতক্ষণ তুমি আমার কথামত কাজ না কর, আমাকে মারতে পারবে না!" রাজা বললঃ "সেটা কি?" সে উত্তর দিল, "সমস্ত লোকজনকে একটি সমতল ভূমিতে জমায়েত কর আর আমাকে একটি (গাছের) গুঁড়ির সাথে বাঁধ। তারপর আমার তূন থেকে একটি তীর নিয়ে ধনুকের মধ্যখানে রাখ এবং বল, 'বালকটির রব্ব, আল্লাহর নামে!' , এরপর আমাকে তীর মার। যদি তুমি এটা কর, আমাকে মেরে ফেলবে (মারতে সক্ষম হবে)।" সেইমত, রাজা সমস্ত লোকজনকে একটি সমতল ভূমিতে এক করলেন এবং ছেলেটিকে একটি (গাছের) গুঁড়ির সাথে বাঁধলেন। এরপর তূন থেকে একটি তীর নিয়ে, ধনুকের মধ্যখানে বসালেন এবং বললেন, "বালকটির রব্ব আল্লাহর নামে!" এবং তীর নিক্ষেপ করল। তীর বালকটির কপালের পাশে আঘাত করল। সে নিজের কপালের পাশে হাত রাখল এবং মৃত্যুবরণ করল। আর লোকজন বলে উঠল, "আমরা বালকটির রব্বের উপর ঈমান আনলাম... আমরা বালকটির রব্বের উপর ঈমান আনলাম, তখন রাজাকে বলা হল, "তুমি কি দেখছ যা তুমি ভয় করেছিলে? আল্লাহর কসম! যা তুমি ভয় করেছিলে তাই ঘটেছে! লোকের ঈমান এনে ফেলেছে (বালকটির রব্বের উপর)।" তখন রাজা প্রতিটি রাস্তার সন্ধিস্থলে পরিখার (খননের) আদেশ দিলেন। পরিখা খনন করার পর সেগুলোতে আগুন জালানো

হল আর রাজা ঘোষণা করলেন, “যে কেউ নিজের ধর্ম ত্যাগে সম্মত হবে না, তাকে আগুনে ফেলে দাও বা আগুনে ঝাঁপ দিতে বল।” আর ঘটনাটি এরকমই ঘটেছিল, শেষ পর্যন্ত এক মহিলা নিজের সন্তানকে নিয়ে আগুনে ঝাঁপ দেয়ার ব্যাপারে দ্বিধা বোধ করলেন, তার বাচ্চাটি এমতাবস্থায় বলে উঠল, “হে আমার মা! ধৈর্য ধর, কারণ তুমি সত্যের উপরে আছ!”

হাদীসটি থেকে এটা পরিষ্কার, যে বালকটি নিজেই নিজের মৃত্যুর কারণ ঘটিয়েছিল যাতে জনমানুষ ইসলাম গ্রহন করে এবং জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে যায়। আর তাই, এরকম একটি আমল শরীয়ত অনুযায়ী আত্মহত্যা নয়। বরং, এটা সবচাইতে প্রশংসিত আমলগুলোর অন্যতম।

এখানে এটাও প্রমাণিত হল যে, ঠিক যেমন বালকটি ইসলামের জন্যে নিজের মৃত্যুর কারণ ঘটালো, শহীদী অভিযান পরিচালকের জন্যেও নিজের মৃত্যু ঘটানো বৈধ যদি এতে ইসলামের উল্লেখযোগ্য উপকারিতা থাকে (যা আলেম ও মুজাহিদরা নির্ণয় করবেন)। যদি কেউ দাবি করতে চায় যে বালকটি নিজের হাতে নিজের মৃত্যু ঘটায়নি, সেক্ষেত্রে আলেমরা উল্লেখ করেছেন যে একজন আত্মহত্যাকারী সে নিজেই নিজেকে হত্যা করুক বা অন্য কাউকে দিয়ে নিজেকে গুলি করাক, তার উপর একই হুকুম বর্তায়। তাই, হত্যার ধরন ধর্তব্য নয়, বরং আত্মহত্যার ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীর গুরুত্বপূর্ণ)। একইভাবে শাহাদাৎ সন্ধানকারীর ক্ষেত্রে এটা গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, সে নিজের হাতে নিজেকে হত্যা করেছে নাকি শত্রুর হাতে মরেছে যতক্ষণ তার নিয়্যত সহীহ থাকে অর্থাৎ আল্লাহর কালামকে উচ্চ করা এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা, কাফিরদেরকে আতংকিত করা ইত্যাদি, আর আল্লাহই সর্বাপেক্ষা জ্ঞাত।

এজন্যই শহীদী অভিযান বৈধ কারণ এতে নিজের জীবন উৎসর্গ করা হয়, আল্লাহর কালামকে উচ্চ করার জন্য, তার দীন প্রসারের জন্য, তার শত্রুদের আতংকিত করার জন্য এবং তার বান্দাদের (মুসলিমদের) লড়াই এর প্রতি উৎসাহিত করতে

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১০১৭

জামাআহ্ প্রসঙ্গ :কিছু মৌলিক কথা

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

১০-১০-২০১৮

জামাআহ্ প্রসঙ্গে এক ভাই কিছু বিষয় জানতে চাচ্ছিলেন। মুহতারাম ভাইয়ের প্রশ্নগুলো দেখে আসছিলাম। কিন্তু ব্যস্ততার কারণে জওয়াব দেয়ার সুযোগ হয়নি। ইনশাআল্লাহ জামাআর বিষয়ে মৌলিক কিছু কথা বলছি। বিস্তারিত কিতাবাদিতে খোঁজ করা যেতে পারে। সুযোগ পেলে তানজীমের কোন আলেমের সাথে কথাও বলে নেয়া যেতে পারে।

প্রথমত: আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ দেখতে চান। ঐক্যবদ্ধ থাকলেই শত্রুর বিরুদ্ধে কামিয়াব হওয়া যাবে। অন্যথায় সম্ভব নয়। এজন্য আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে ঐক্যবদ্ধ থাকতে আদেশ দিয়েছেন। সব ধরণের বিচ্ছিন্নতা থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

“আর তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং বিচ্ছিন্ন হয়ো না।” (আলে ইমরান: ১০৩)

অন্যত্র ইরশাদ করেন,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের পছন্দ করেন, যারা সারিবদ্ধ হয়ে তার রাস্তায় যুদ্ধ করে যেন তারা সীসাঢালা প্রাচীর।” (সফ: ৪)

পারস্পরিক বিবাদে লিপ্ত হলে আল্লাহর নুসরত কমে যাবে। শত্রুর সামনে হীনমন্য হয়ে পরাজিত হতে হবে।

আল্লাহ তাআলার বাণী,

وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

“পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হইও না। যদি তা কর, তবে তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে। আর তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।” (আনফাল: ৪৬)

হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে বলেছেন। বিচ্ছিন্ন হতে নিষেধ করেছেন। যে ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন থেকে মারা যাবে, সে জাহিলী যামানার লোকদের মতো মারা যাবে বলে সতর্ক করেছেন। **এক হাদিসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,**

« من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه »

“যে ব্যক্তি জামাত থেকে এক বিঘতও সরে গেল, যেন সে নিজের গর্দান থেকে ইসলামের রজ্জু খোলে ফেলল।” (আবু দাউদ: ৪৭৬০)

অন্য হাদিসে ইরশাদ করেন,

من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية

“কারো কাছে তার আমীরের কোন কিছু অপছন্দনীয় মনে হলে সে যেন সবর করে। কেননা, যে ব্যক্তি সুলতান থেকে এক বিঘতও সরে গিয়ে মারা গেল, সে জাহিলী মরা মরল।” (বুখারী: ৭০৫৩)

মুসলমানদের পারস্পরিক ঐক্য এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, মুসলমানগণ শরয়ী কোন এক খলিফার অধীনে ঐক্যবদ্ধ থাকাবস্থায় যদি দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি খেলাফতের দাবি করে, তাহলে তাকে হত্যা করে দিতে বলা হয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

«إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما»

“যদি দুই খলিফার বাইয়াত হয়, তাহলে দ্বিতীয় জনকে হত্যা করে দাও।” (মুসলিম: ৪৯০৫)

অন্য হাদিসে ইরশাদ করেন,

»من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه

"তোমরা এক ব্যক্তির (অর্থাৎ এক খলিফার) উপর ঐক্যবদ্ধ থাকাবস্থায় যদি কোন ব্যক্তি তোমাদের ঐক্য বিনষ্ট করতে আসে বা জামাতে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে আসে, তাহলে তাকে হত্যা করে দাও।" (মুসলিম: ৪৯০৪)

অতএব, সারা মুসলিম উম্মাহকে এক খলিফার অধীনে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। এটাই শরীয়তের নির্দেশ।

তবে এ বিধান হল তখন, যখন খেলাফত কায়েম থাকবে এবং একজন শরয়ী ইমাম বিদ্যমান থাকবেন। তখন তার কাছে বাইয়াত না দিয়ে বিচ্ছিন্ন থাকা গোমরাহি।
পক্ষান্তরে যদি খেলাফত কায়েম না থাকে, তাহলে খেলাফত কায়েম করতে হবে। এজন্য যুদ্ধ-জিহাদ যা কিছু লাগে করতে হবে। যেমন বর্তমান মুজাহিদ কাফেলাগুলো খেলাফত কায়েমের জন্য জিহাদ করে যাচ্ছেন।

স্পষ্ট যে, খেলাফত কায়েমের জিহাদে নামতে হলে জামাতবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। জামাত ছাড়া জিহাদ সম্ভব না। ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রচেষ্টার দ্বারা দ্বীনের কিছু খেদমত হলেও দ্বীন কায়েম সম্ভব না। খেলাফত প্রতিষ্ঠাও সম্ভব না।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. জামাতের গুরুত্বটা এভাবে তুলে ধরেছেন-

يجب ان يعرف ان ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لاقيام للدين ولا للدنيا إلا بها فان بنى آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم الى بعض ولابد لهم عند الاجتماع من رأس حتى قال النبى إذا خرج ثلاثة فى سفر فليؤمروا أحدهم رواه أبو دواد من حديث أبى سعيد و ابى هريرة

وروى الامام أحمد فى المسند عن عبد الله بن عمرو ان النبى قال لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم فأوجب تأمير الواحد فى

الاجتماع القليل العارض فى السفر تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع ولأن الله تعالى اوجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل و إقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم و إقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والامارة.اهـ

"জানা আবশ্যক যে, জনগণের নেতৃত্ব দেয়া দ্বীনের অন্যতম সুমহান আবশ্যক দায়িত্ব। শুধু তাই নয়, নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব ব্যতীত বরং দ্বীন-দুনিয়া কোনটাই চলতে পারে না। কেননা, পারস্পরিক ঐক্যবদ্ধ হওয়া ব্যতীত মানব জাতির মাসলাহাতসমূহের পরিপূর্ণতা সম্ভব নয়। কারণ, তারা একে অপরের মুখাপেক্ষী। আর ঐক্যবদ্ধ হতে গেলে তাদের একজন নেতা আবশ্যক। রাসূল সাল্লাললাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো এমনটি পর্যন্ত বলেছেন:

إذا خرج ثلاثة فى سفر فليؤمروا أحدهم

'তিন ব্যক্তি সফরে বের হলে তারা যেন তাদের একজনকে তাদের আমীর বানিয়ে নেয়।'
ইমাম আবু দাউদ রহ. হাদিসটি হযরত আবু সায়িদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ রহ. মুসনাদে আহমদে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাললাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

لايحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم

'যে কোন তিন ব্যক্তির জন্য কোন মরু ময়দানে অবস্থান করা জায়েয হবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের একজনকে তাদের আমীর বানিয়ে নেয়।'

সফরের হালতে সৃষ্টি হওয়া ছোট্ট একটি জামাআতের বেলায়ও একজনকে আমীর বানিয়ে নেয়ার আদেশ দিয়েছেন একথা বুঝানোর জন্য যে, সব ধরণের জামাআতের ক্ষেত্রেই আমীর বানিয়ে নেয়া আবশ্যক।

তাছাড়া আল্লাহ তাআলা 'আমর বিল মা'রুফ ও নাহি আনিল মুনকার' ফরয করেছেন। আর তা প্রভাব প্রতিপত্তি ও নেতৃত্ব ব্যতীত পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

তদ্রূপ: জিহাদ, ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা; হজ্ব, জুমআ ও ঈদ কায়েম করা; মাজলুমকে সাহায্য করা, হদসমূহ কায়েম করা ইত্যাদিসহ আল্লাহ তাআলার ফরযকৃত যাবতীয় বিধান প্রভাব প্রতিপত্তি ও নেতৃত্ব ব্যতীত পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়।"
(মাজমুউল ফাতাওয়া: ২৮/৩৯০)

জামাতবদ্ধ হওয়ার গুরুত্বের ব্যাপারে হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্য সর্বদা স্বরণ রাখা চাই।

তিনি বলেন:

لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بطاعة

"জামাআতবদ্ধ হওয়া ব্যতীত দ্বীনে ইসলামের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। আর জামাআত হয় না নেতৃত্ব (তথা আমীর নির্ধারণ) ব্যতীত। আর (আমীরের) আনুগত্য ব্যতীত নেতৃত্বের কোন ফায়েদা নেই।" (জামিউ বয়ানিল ইলম: ১/২৬৩)

অতএব, কোন এক জিহাদি কাফেলার সাথে মিলে যেতে হবে। জিহাদি কাফেলা না থাকলে কাফেলা গঠন আবশ্যক। আর আগে থেকেই থেকে থাকলে তার সাথে মিলে যাওয়া আবশ্যক।

তবে যেকোন কাফেলার ক্ষেত্রেই এটা অত্যাবশ্যক যে, তা শরীয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। শরীয়তমতে পরিচালিত হতে হবে। কুরআন হাদিসে যত জায়গায় জামাতের সাথে মিলে থাকার কথা এসেছে, সবখানে জামাত দ্বারা এমন জামাতই উদ্দেশ্য। আল্লাহর রাসূল ও তার সাহাবায়ে কেরামের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত জামাত উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে কাফেলা যদি জাতিয়তাবাদি বা ধর্ম নিরপেক্ষ হয় বা অন্য কোন গোমরাহির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে তার সাথে যোগ দেয়া যাবে না। তদ্রূপ যদি পরিষ্কার জানা না থাকে যে, তা শরীয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত কি'না- তাহলেও তার সাথে যোগ দেয়া যাবে না। এমন গোলক ধাঁধায় যুক্ত হওয়া নিষেধ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية

"যে ব্যক্তি এমন ঝাণ্ডা তলে যুদ্ধ করে যা হক না বাতিল জানা নেই, যে তার আপন গোত্রের স্বার্থে ক্রোধান্বিত হয় কিংবা গোত্রের দিকে আহবান করে বা অন্যায়ভাবে গোত্রের সহায়তা করে আর এভাবেই মারা যায়, তাহলে সে জাহিলী মরা মরল।" (মুসলিম: ৪৮৯২)

সারকথা দাঁড়াল: আপনি যে জামাতের সাথে যুক্ত হবেন, তাতে আবশ্যকীয়ভাবেই দু'টি বৈশিষ্ট থাকতে হবে,

ক. সঠিক আকীদা মানহাজ বিশিষ্ট জিহাদি জামাত হতে হবে।

খ. শরীয়ত অনুযায়ী পরিচালিত হতে হবে।

এ দুই বৈশিষ্ট পাওয়া গেলে আপনি ইনশাআল্লাহ তাতে যুক্ত হতে পারেন।

প্রশ্ন: যদি একাধিক জামাত থাকে তাহলে কি করবো?

উত্তর: সকল জিহাদি কাফেলার উচিৎ সকলে মিলে এক কাফেলা গঠন করা। বিচ্ছিন্নতা আল্লাহ তাআলার পছন্দ নয়। তবে যদি বিশেষ পরিস্থিতি ও ওজরের কারণে এক হওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে আলাদা আলাদা থেকেই কাজ করে যাবে। এমতাবস্থায় যার জন্য যে জামাতে যুক্ত হওয়া সহজ এবং উম্মাহ ও জিহাদের জন্য অধিক উপকারী- সেটাতে যুক্ত হয়ে যাবে।

আলেম সমাজ প্রসঙ্গ:

আমাদের বর্তমান আলেম সমাজ মূলত কোন জামাতের উপর প্রতিষ্ঠিত নেই যাতে যোগ দেয়া যাবে। ব্যক্তি পর্যায়ে যে যেভাবে পারছেন দ্বীনের খেদমত করার চেষ্টা করছেন। অবশ্য ছোটখাট কিছু সংগঠন-ঐক্য আছে। তবে সেগুলো জিহাদি নয়। আর রাজনৈতিক দলগুলো স্পষ্টই গোমরাহিতে লিপ্ত। অতএব, বর্তমান আলেম সমাজ যেভাবে আছেন, এমতাবস্থায় তাদের গণ্ডির মাঝে সীমাবদ্ধ থেকে জিহাদের দায়িত্ব আদায় সম্ভব না। জিহাদের জন্য জিহাদি কাফেলায় যোগ দিতে হবে। তবে আলেম উলামাদের দ্বীনি খেদমতমূলক শরীয়তসম্মত যেসব জামাত বা সংগঠন আছে, জিহাদের কাজের ক্ষতি না হয় এমনভাবে তাতে মিলে কাজ করতেও

সমস্যা নেই। বরং সামর্থ্যানুযায়ী তাদের সহযোগিতার চেষ্টা করা উচিৎ। কেননা, আলেম উলামারাই জাতির রাহবার। যদি আলেম উলামারা নেতৃত্বে না থাকেন, তাহলে আমাদের জিহাদি কাফেলাগুলোও হক পথে চলতে পারবে না।

উল্লেখ্য, আলেম উলামারা জামাতবদ্ধ না থাকার কারণে ঢালাওভাবে তারা গোমরাহিতে লিপ্ত আছেন- এমনটা নয়। কারণ, এখন খেলাফত প্রতিষ্ঠিত নেই। খেলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকলে খলিফার হাতে বাইয়াত না দিয়ে বিচ্ছিন্ন থাকলে সেটা গোমরাহি হতো। হাদিসে যেখানে বলা হয়েছে যে, বাইয়াত ছাড়া মারা গেলে জাহিলী মরা মরবে- সেখানে এটাই উদ্দেশ্য। তবে খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদে যোগ দেয়া, জিহাদি কাফেলা গড়ে তোলা বা থেকে থাকলে তার সাথে মিলে যাওয়া এবং তাকে শরীয়ত অনুযায়ী পরিচালিত করা আলেম সমাজের দায়িত্ব। সামর্থ্যানুযায়ী প্রত্যেককে তার দায়িত্ব আদায় করা জরুরী। যার জন্য তানজীমে যুক্ত হওয়া সম্ভব, তাকে তানজীমে যুক্ত হতে হবে। আর যার জন্য সম্ভব নয় বা অতিশয় কষ্টসাধ্য, তিনি সামর্থ্যানুযায়ী দ্বীনের খেদমত করে যাবেন। যতদূর পারেন, জিহাদ ও মুজাহিদদের নুসরত করবেন। এতেই তিনি মাফ পাবেন ইনশাআল্লাহ।

দ্বিতীয়ত: সাধারণ জনগণকে হকপন্থী আলেম উলামার কথামতো চলতে হবে- চাই তারা বাহ্যত তানজীমে যুক্ত থাকুন না থাকুন। বর্তমান পরিস্থিতি বড়ই কঠিন। আলেম উলামা সকলের জন্য প্রকাশ্যে তানজীমে যুক্ত হওয়া কঠিন। কাজেই তানজীমে যুক্ত থাকা না থাকাকে আনুগত্যের মানদণ্ড বানানো যাবে না। তবে অবশ্যই হকপন্থী হতে হবে। জিহাদ বিরোধী না হতে হবে। সামর্থ্যানুযায়ী হকপন্থী মুজাহিদদের সমর্থন ও নুসরত করেন এমন হতে হবে।

এ হল সাধারণ মাসআলা মাসায়েলের ক্ষেত্রে। আর যেসব বিষয় তানজীমি কাজের সাথে জড়িত, সেগুলো তানজীমের উলামায়ে কেরাম ও উমারাদের থেকেই নিতে হবে। একান্ত তানজীমি বিষয়ে বাহিরের উলামাদের কথা ধর্তব্য নয়। তানজীমের উলামা ও উমারাগণ যারা এ ময়দানে অভিজ্ঞ, তাদের কথাই মেনে চলতে হবে।

তৃতীয়ত: আলেম যদি জিহাদ বিরোধী হয়, তাহলে তার থেকে দূরে থাকা উচিৎ। তবে শরীয়তের যেসব বিষয় তারা ছাড়া অন্যদের কাছে পাবো না, সেগুলো তাদের কাছ থেকে নেয়া ছাড়া উপায় নেই। সেগুলো তাদের কাছ থেকে নিতে হবে। আর জিহাদ সংক্রান্ত বিষয়াশয় সরাসরি মুজাহিদ বা হকপন্থী আলেম উলামা থেকে নিতে

হবে।

শায়েখ আবু মুহাম্মদ আলমাকদিসি হাফিজাহুল্লাহ বলেন,

وأوصي إخواني دوما بأن لا يحرموا أنفسهم من خير يستفيدونه من كائن من كان، ولا يمنعنا انحراف بعض العلماء في أبواب من الدين: أن نستفيد منهم في أبواب لم ينحرفوا فيها؛ خصوصا في زمن شح العلماء الربانيين وندرتهم، وحاجة طالب العلم إلى تلقي بعض أنواع العلوم من أفواه العلماء؛ ولو كان في الأمر سعة وتوفر لنا العلماء الربانيون الذين نرتضي دينهم ونهجهم؛ لما لجأنا لمثل هذا ولما اضطررنا إليه؛ ولَحَرِصنا على تطبيق مقالة السلف: (إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم) ولكن هيهات ذاك في مثل زماننا ... فالحمد لله أولا وآخرا أن علّمنا ويسر التعلم لنا؛ فهدانا إلى تعلم ما نحتاجه لنصرة التوحيد ومحاربة الشرك وإبطال التنديد، فذلك هو المقصود وهو الهدف المنشود؛ ولأجله درسنا وتعلمنا وصبرنا على أخطاء كثير ممن أخذنا عنهم مفاتيح العلوم. اهـ

"আমি সর্বদা ভাইদের অসিয়্যত করি, তারা যেন ইলম অর্জন করা থেকে নিজেদের বঞ্চিত না করে- তা যার কাছ থেকেই হোক। ইলমের কিছু অধ্যায়ে কিছু আলেমের বিচ্যুতি অন্যান্য বিষয় তাদের কাছ থেকে শিখার প্রতিবন্ধক নয়। বিশেষ করে প্রকৃত আলেমদের সল্পতার এ সময়ে। কেননা কিছু কিছু বিষয় আলেমদের থেকে সরাসরিই শিখতে হয়।

যদি সঠিক আকীদা-মানহাজের আলেমদের কাছ থেকে ইলম শিক্ষা করা সম্ভব হতো তাহলে আমরা এধরণের আলেমদের থেকে ইলম অর্জন করতে বাধ্য হতাম না। তখন আমরা সালাফের এই বাণী: **إن هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك** (এই ইলম দ্বীনের অংশ। সুতরাং তুমি কার থেকে তোমার দ্বীন শিখছো তা লক্ষ্য রেখ) -র উপর আমল করতে আগ্রহী হতাম। কিন্তু এ যমানায় তা কি করে সম্ভব?

আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া যে, তিনি আমাদেরকে ঐ সকল বিষয় শিখার তাওফিক দিয়েছেন, যা দ্বারা আমরা তাওহিদের সাহায্য ও শিরকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে

সক্ষম হয়েছি। এ কারণেই আমরা যাদের কাছ থেকে ইলমের চাবিকাঠি বা মাধ্যমগুলো শিখেছি তাদের অনেক ভুলের উপর আমরা ধৈর্য ধারণ করেছি"। (ইরশাদুল মুবতাদী ইলা কাওয়ায়িদিস সা'দী; পৃ: ৪)

তালেবান প্রসঙ্গ:

মুহতারাম ভাই তালেবান প্রসঙ্গে জানতে চেয়েছেন,

"অনেকেই বলে থাকেন যে, তালেবান হক না। কারণ তারা শিশুদেরকেও হত্যা করে। দলিল হিসেবে পেশ করে পেশওয়ারের ঘটনাকে। এখন প্রশ্ন হলো, তালেবান যদি এরকম আক্রমণ করেই থাকে তাহলে কেন করেছে?"

উত্তর: তালেবানদের বিষয়টা দুনিয়া অবধি সুস্পষ্ট যে, তারা হক জামাত। আর তারা শিশু হত্যা করেন কথাটা নির্জলা মিথ্যা। তবে কোন কোন অপারেশনে অনাকাঙ্খিতভাবে কিছু শিশু নিহত হয়ে থাকলে সেটা ভিন্ন কথা। তালেবানরা যেহেতু এমন ভূমিতে জিহাদরত, যেখানকার অধিকাংশ জনগণ মুসলমান- তাই মুরতাদদের উপর হামলা হলে অনাকাঙ্খিতভাবে কিছু মুসলমান নিহত হতেই পারে। সর্বাত্মক প্রচেষ্টার পরও যদি কিছু মুসলমান নিহত হয়ে যায়, তাহলে এটা সমালোচনার কিছু নয়। এ ধরণের হামলা সম্পূর্ণ শরীয়তসম্মত। মুজাহিদিনে কেরাম সর্বাত্মক চেষ্টা করেন, যেন কোন মুসলমানের বা কোন শিশুর প্রাণ না ঝরে। এরপরও অনাকাঙ্খিতভাবে হয়ে গেলে এর জন্য মুজাহিদিনে কেরাম দায়ী থাকবেন না। এই আশঙ্কায় যদি হামলা বন্ধ করে দেয়া হয়, তাহলে কোনো দিন জিহাদ করা সম্ভব হবে না। হাদিস ও ফিকহের কিতাবাদিতে এসব বিষয় সুস্পষ্ট বিধৃত আছে। একটু কষ্ট করে চোখ বুলালেই পাওয়া যাবে। কিন্তু দ্বীনের দুশমনেরা এ ধরণের কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে ফলাও করে অপপ্রচার করে মুজাহিদিনে কেরামের মুড নষ্ট করার চেষ্টায় থাকে। অনেক সময় তারা নিজেরাই হত্যা করে মুজাহিদদের নামে চালিয় দেয়।

অধিকন্তু মুজাহিদগণ তো আর মাছুম নন যে, তাদের কোন ভুল-ভ্রান্তি বা কোন গুনাহ হতে পারে না। অন্য দশজন মানুষের মতো তাদেরও গুনাহ হতে পারে। কিছু মুজাহিদের ভুল বা গুনাহের কারণে তো আর গোটা জামাত বাতিল হয়ে যায় না। যে গুনাহ করেছে, তার গুনাহের বুঝা তাকে বইতে হবে। আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে মাফও করতে পারেন। এ কারণে গোটা জামাত বাতিল হয়ে যাবে না।

এ ধরণের বাহানা খুঁজে জিহাদ থেকে সরে দাঁড়ানোরও কোন অবকাশ নেই। ওয়াল্লাহু সুবহানাহু ওয়াতাআলা আ'লাম।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১১৩৯

যে গাফেলতির ফল হিসেবে আমরা পেলাম রক্ত মাখা জিল্লতি!

s_forayeji

Moderator

১১-০৯-২০১৮

বিসমিল্লাহ - ওয়াস সালাতু আস সালাম আলা রাসুলিল্লাহ

জাতি হিসেবে আমরা একসময়ে নিশ্চয়ই মানবিকতা, শিক্ষা এবং সভ্যতার দিক থেকে সবেচেয়ে উন্নত ছিলাম, যখন আমরা ইসলামের মধ্যে ছিলাম। এটা শুনলে আজ মুসলিম ঘরের অনেক সন্তান হেসে উড়িয়ে দেয় আমি তাদের ব্যাপারে বলব তারা উদ্ধত, এবং বঞ্চিত; ইসলামের স্পর্শ থেকে। অনেকে ভদ্র ভাবে চুপ থাকে আর তারা আসলে ভদ্র তাই চুপ থাকাকেই শ্রেয় মনে করে। আর অনেকে বিশ্বাস করতে চায় কিন্তু পারেনা তাদের ব্যাপারেই আমার এই লেখা। আমার এই লেখার উদ্দেশ্য এই না যে আমি আমাদের গৌরবজ্জল ইতিহাসের উপরে অনেক অনেক আলোচনা করে তৃপ্তির ঢেকুর তুলতে চাই, বরং কিছুটা ইতিহাস এজন্য সামনে নিয়ে আসা যেন তা চিন্তাশীলদের জন্য কিছু চিন্তার খোরাক জোগায়। আজ আমরা মুসলিম হিসেবে যতটুকু ইসলামের ইতিহাস জানি দুঃখজনক ভাবে সত্য যে অনেক কাফের আমাদের চেয়ে এই ব্যাপারে বেশি জানে! তারা ইসলাম কে এই জন্য জানার চেস্টা করেনা যে তারা মুসলিম হয়ে যাবে বা তারা এই ধর্মের অনুসারী হবে বরং তারা গৌরবময় ইসলামের ব্যাপারে আরো বেশি জানতে চায়। আমরা নিজেরা আজ আমাদের ইতিহাস সম্পর্কে বিস্মৃত হয়ে গেছি। কবে কোথায় ঠিক কোন জায়গা থেকে কি কারণে আমাদের এই অধঃপতন শুরু হয়েছিল তা অন্য আরেকদিনের আলোচনা হতে পারে, তবে এতটুকু নিশ্চিত যে আমরা যেদিন থেকে আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে গেছিলাম সেদিন থেকেই আমাদের অধঃপতন শুরু। আর হ্যাঁ, এখানে একটি বিষয় অবশ্যই উল্লেখ করা দরকার - যখন বলা হয় দ্বীন বা ইসলাম এর অর্থ আজকের দিনের পশ্চিমা ইসলাম (islam of west) নয়, বরং এই ইসলাম অর্থ রাসুল সাঃ এবং তাঁর সাহাবী গন যে ইসলাম পালন করেছেন প্রচার করেছেন এবং যেই ইসলামের উপরে তাঁরা জীবিত ছিলেন।

ইসলাম কে পরিত্যাগ করার কারণে, ইসলামের ব্যাপারে অবহেলা এবং উদাসিনতার কারণে আমাদের কি ক্ষতি হয়েছে তা প্রকাশ করা অসম্ভব! **শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, আজ সারা দুনিয়ায় মুসলিম উম্মাহ'র যে করুন অবস্থা এর মূল কারণ আমরা ইসলাম থেকে দূরে সরে গেছি। এখানে আমাদের যেমন উদাসীনতা এবং গাফেলতি আছে তেমনি কাফেরদের চেষ্টারও কোন কমতি ছিলোনা। এখনো নাই।** এই দুই মিলেই আমাদের আজ এই অবস্থা! আল্লাহ আমাদের মাফ করুন, আমিন।

ঠিক যে বিষয়টি আজকে বলার উদ্দেশ্য তা হচ্ছে –

প্রতিনিয়ত ইসলাম কে বিভিন্ন ভাবে আঘাত করা হয়। এই আঘাতের একটি ধরন হচ্ছে আমাদের ঈমান আকিদাহ এবং আদর্শের উপরে আঘাত। তারা যা করে তা হচ্ছে প্রতিনিয়ত সম্ভাব্য সমস্ত রকম পদ্ধতিতে তারা আমাদের ঈমান এবিং আকিদাহ এর উপরে আঘাত করতে থাকে। কখনো আপনি তা বুঝতে পারবেন, অধিকাংশ সময়েই পারবেন না। কখনো এটা সরাসরি আঘাত যেমন বাকস্বাধীনতার নামে রাসুল সাঃ কে কটুক্তি করা আবার **কখনো এটা সরাসরি নয় যেমন সংস্কৃতির নামে আমাকে এবং আপনাকে দ্বীনের মৌলিক আদর্শ থেকে এমন বিচ্যুত করে দেয় যে লিভ টুগেদার বা সমকামিতার মত বিষয় গুলো ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে প্রসার পায়। আবার কখনো তারা আমাদেরকে অনেক জরুরী বিষয় থেকে দৃষ্টি সরিয়ে অপ্রয়োজনীয় কোন বিষয়ে ব্যাস্ত করে দেয়। যেমন জিহাদের ব্যাপারে মনোযোগ নষ্ট করে দিয়ে মাজহাব নিয়ে ব্যাস্ত করে দেয়া।**

প্রথম বিষয় টি হচ্ছে সরাসরি আমাদের ঈমান এবং আকিদাহ এর উপরে আক্রমন। এই বিষয়টি মূলত দুই ভাবে ঘটে।

এক - তারা অনবরত আমাদের দিকে বিভিন্ন সন্দেহ ছুঁড়ে দিতে থাকে। আমাদের মনে অসংখ্য সন্দেহ তৈরি করতে পারাই তাদের মূল লক্ষ্য। আর বিষয়টি এমন না যে - কিছু মানুষ এই সন্দেহ গুলো তৈরি করে। বরং পুরা একটি সমাজ ব্যাবস্থা, একটি রাষ্ট্র ব্যাবস্থা, শিক্ষা ব্যাবস্থা, একটি পুরা সিস্টেম এই কাজ করতে থাকে। তাদের এই সমন্বিত টিম আপনাকে বলবে আরে এটা কি ইসলামে আছে? কই কুরআনের কোন জায়গায় লেখা আছে দেখাও? তাদের আলেম রা আপনার সামনে সুন্দর লেবাসে এসে আপনাকে কুরআন থেকেই ব্যাখ্যা দিয়ে দিবে, তাদের

মিডিয়া অনবরত আপনাকে সন্দিহান করে তুলবে। তাদের বুদ্ধিজীবীরা আপনার মাথায় অসংখ্য প্রশ্ন সৃষ্টি করবে।

এগুলো করে তাদের লাভ কি? **তারা চায় আপনার এবং আমার বিশ্বাসের ভিত কে নড়বড় করে দিতে। কারণ সেটা করতে পারলেই তারা তাদের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে।** ঈমানই হচ্ছে তাদের পথে একমাত্র অন্তরায়। তারা খুব ভালো করেই জানে আমি কিংবা আপনি পুরা কুরআন পড়িনি, আমি বা আপনি প্রতিটি আয়াতের অর্থ শানে নুযূল এবং এগুলোর প্রয়োগ বিস্তারিত জানিনা। আর তারা এই সুযোগটাই কাজে লাগায়। তারা জানে আমরা অন্ধ হয়ে আছি আর এজন্য তারা যেদিক দিয়ে ইচ্ছা আমাদের কে আঘাত করে।

কিন্তু আমি তো চুপচাপ এই আঘাত সয়ে নিজের ঈমান বিক্রি করে দেয়ার জন্য আসিনি, না আমাদের অবস্থান তেমন হওয়া উচিত। দেখেন কাফেররা তাদের পরিকল্পনায় আপাতত মোটামুটি সফল কিন্তু তারা সামগ্রিক ভাবে পুরাপুরি ব্যার্থ। কারণ তারা একটি বিষয় হয় জানে না অথবা জানলেও উপেক্ষা করা ছাড়া তাদের কোন গতি নাই সেটি হচ্ছে - **আল্লাহ মুমিনদের সাথেই আছেন।** আর আল্লাহর এই কথার উপরে বিশ্বাস করেই আমার এই লেখা - এত সহজে কাফেরদের ছেড়ে দেয়ার বা তাদের চালে পা দেয়ার কোন কারণ নাই।

হ্যাঁ আমরা নিজেরাই নিজেদের উপরে জুলুম করেছি, কিন্তু ইনশাআল্লাহ এখনো সময় শেষ হয়ে যায়নি। কাফেররা কিংবা তাদের দালালরা আমাদের সামনে বিক্ষিপ্ত সন্দেহ ছুঁড়ে দেয়। যেগুলো অধিকাংশই প্রেক্ষাপট ছাড়া। কিংবা তারা কোন একটি বিষয়ে আগে থেকে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে এর পরে আমাদের কে সেই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করে। এমন ক্ষেত্রে আমরা অধিকাংশই যা করি তা হচ্ছে, আমি নিজে কি মনে করি তা দিয়ে কাজ চালানোর চেস্টা করি। অথবা কাফেররা আমাদের মুখ থেকে যা শুনতে চায় কোন রকমে সেরকম কিছু একটা শুনিয়ে আপাতত তাদের হাত থেকে নিজেকে বাচিয়ে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করি। দুটিই ভুল।

প্রথম কথা - আপনাকে মনে রাখতে হবে যখন আপনি একজন কাফের বা তার দালালদের কোন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন তখন তার অবস্থান থেকে আপনি উত্তর দিলে হবে না। বরং আপনাকে আপনার নিজের অবস্থান থেকে উত্তর দিতে হবে।

একজন কাফের চাইবে আপনি তার কথায় সন্দিহান হয়ে তার জায়গায় নেমে উত্তর দেন তাহলেই আপনি হেরে গেলেন। বরং আপনি আপনার ঈমানের জায়গায় স্থির থেকে উত্তর দেন। একটা বিষয় মনে রাখতে হবে অই শয়তানরা আপনার চেয়েও হয়ত দ্বীনের ব্যাপারে কম জানে কিন্তু হয়তা তারা আপনাকে এমন ব্যাপারে প্রশ্ন করেছে যে ব্যাপারে আপনার জ্ঞান নাই। **আপনার এই পরাজয়ের উপরে ভিত্তি করে তারা আদর্শ হিসেবে ইসলাম কে ভুল প্রমান করতে চাইবে। এটিই তাদের ফাদ।** কিন্তু আপনি টেবিল ঘুরিয়ে দেন এবং তাকে আপনার ফাঁদে টেনে নিয়ে আসেন। কেউ যদি আপনাকে প্রশ্ন করে –

ইসলাম জঙ্গিবাদ কে সমর্থন করে - হ্যাঁ অথবা না?

এখন এই কথার ব্যাপারে আপনার যদি পূর্ণ জ্ঞান থাকে আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু যদি না থাকে তবে এই প্রশ্নের ফাঁদে পা দেয়ার আগে আপনি তার মানসিক অবস্থান চিন্তা করে নেন। সে চাচ্ছে আপনি স্বীকার করেন ইসলাম জঙ্গিবাদকে সমর্থন করে তাহলেই সে আপনাকে পরের ফাঁদে ফেলতে পারবে।

বরং আপনি তার দিকে টেবিল ঘুরিয়ে দেন, জিজ্ঞেস করেন - **আপনি কি জঙ্গিবাদ সম্পর্কে জানতে চান নাকি ইসলাম সম্পর্কে? যদি হয় জঙ্গিবাদ তবে তার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নাই আমি ইসলাম ছাড়াই জঙ্গিবাদ সম্পর্কে আরো অনেক অনেক বেশি বলতে পারব। আমার উত্তর শুনার আগে আপনি ই বরং আমাকে বলেন জঙ্গিবাদ এর সংজ্ঞা কি? আপনি যা জানেন সেই সংজ্ঞার উপরে ভিত্তি করে আমি আপনাকে জঙ্গিবাদের ব্যাপারে বলব। আর আপনি যদি ইসলাম সম্পর্কে জানতে চান তবে আপনার প্রশ্ন টা আবার করুন কারণ আপনার প্রশ্ন সঠিক ছিলোনা।**

মনে রাখবেন তার ভরসা যেমন প্রতারনা আপনার ভরসা ঈমান। সে যেমন কোন অবস্থাতেই তার প্রতারনা কে ছাড়তে চাইবেনা। আপনি তেমনি কোন অবস্থাতেই আপনার ঈমান কে ছাড়তে চাইবেন না। সে আপনাকে তার প্রতারনার দিকে টানতে চাইবে আপনি তাকে আপনার ঈমানের দিকে টেনে নিয়ে আসেন। **এবং আপনি যখন তাকে ঈমানের দিকে টানবেন সে তেমনি দিশেহারা বোধ করবে যেমন আপনি তার প্রতারনার সামনে করেন।**

আরেকটি বিষয় কখন কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে আর কখন দিতে হবেনা এটিও আমাদের শিখতে হবে। আপনার কাছে জানতে চাইলো ইসলাম নারীদের বোরকা পরিয়ে নারীদের অধিকার নষ্ট করে। আপনি বলেন –

আপনি কি বোরকার ব্যাপারে আগ্রহী নাকি নারীদের অধিকারের ব্যাপারে। সে যদি বলে নারী অধিকারের ব্যাপারে। আপনি তাকে জিজ্ঞেস করেন যেহেতু ইসলাম নারীদের কে কেমন অধিকার দেয় এই ব্যাপারে আপনার যথেষ্ট আগ্রহ দেখা যাচ্ছে তাহলে আপনি বলেন ইসলামে সম্পদ বন্টনে নারীর অধিকার কতটুকু। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনি সঠিক উত্তর পাবেন না। এবার তাকে বলেন, আপনি যদি সত্যি ইসলামে নারীর অধিকার সম্পর্কে জানতে চান তবে আগে এই ব্যাপারে জেনে আসেন এবং একই সাথে ইসলাম ব্যাতিত আর কোন ধর্ম এই ব্যাপারে আর কি বলেছে তাও জেনে আসেন। তখন আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিব।

তাদের ২য় পদ্ধতি

অনেক সময়ে তারা আমাদের কে ফালতু বিবাদের জড়িয়ে ফেলতে চাইবে, যেন আমাদের যুবকদের মেধা সামর্থ্য সময় সবচেয়ে উপযোগী স্থানে ব্যায় না হয়। তাই আমাদের এটিও জানা জরুরী যে এই মুহূর্তে আমার জন্য জরুরী কি? আপনাকে এটা সুস্পষ্ট ভাবে জানতে হবে যে আমি এবং আপনি আমরা সবাই ঈমান বনাক কুফর এর যুদ্ধে লিপ্ত আছি। এখানে অন্য ছোট বিষয়ে ব্যাস্ত হওয়া পরাজয় ছাড়া আর কিছুই না। আপনি যখন বক্সিং রিং এ নেমে গেছেন, আপনার প্রতিপক্ষ আপনাকে একের পর এক ঘুষি মেরেই যাচ্ছে এমন অবস্থায় রেফারি যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করে রিং এর নিয়ম কি কি? আপনার উচিত হবে তার পেটে আগে একটা লাথি মারা। কারণ নিঃসন্দেহে সে আপনার মনোযোগ নষ্ট করার কাজে ব্যাস্ত। কাফেররা শুধু নিজেরাই মাঠে নেমেছে এমন না, বরং তাদের দালালরা ও এ কাজে ব্যাস্ত। আর তাদের দালালরা সংখ্যায় অনেক। আপনি হয়ত অধিকাংশকেই পাবেন তাদের দিকে ঝুকে পড়তে - কিন্তু তাই বলে আমার কিংবা আপনার সেদিকে ঝুকে পড়া যাবেনা।

কারণ আল্লাহ বলেন –

وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ

আর যদি আপনি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথা মেনে নেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিপথগামী করে দেবে। তারা শুধু অলীক কল্পনার অনুসরণ করে এবং সম্পূর্ণ অনুমান ভিত্তিক কথাবার্তা বলে থাকে।

আর সবশেষে - যে বিষয়ের প্রতি অবহেলা আর গাফেলতির কারণে আমাদেরেই দুর্দশা সেই দ্বীনের ব্যাপারে আমাদের যত্নবান হতে হবে। অতিদ্রুত আমাদেরকে আবার দ্বীনের মধ্যেই ফিরে যেতে হবে। কারণ এই দ্বীনই হচ্ছে আমাদের সুরক্ষা বর্ম। উমর রাঃ বলেছিলেন আমরা ছিলাম এক লাঞ্ছিত জাতি, এর পরে আল্লাহ আমাদের কে এই দ্বীনের দ্বারা সম্মানিত করেছেন। আর আজ যদি আমরা এই দ্বীন ব্যাতিত অন্য কিছুর মাধ্যমে আমাদের সম্মান খুজার চেষ্টা করি তাহলে আল্লাহ আমাদের কে আবার লাঞ্ছিত করবেন।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১৪৪৬

তাগুতি চক্রান্তের যে জঘন্য নকশা আমাদের অজানা!

s_forayeji

Moderator

১১-১০-২০১৮

আপনাদেরকে নিয়ে যাই আজ থেকে ১৫০০ বছর আগে। মক্কা। মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ (সাঃ) তখনও নবুয়ত পাননি। মক্কার সবাই তাকে এক নামে চিনে, আল আমিন। সবাই যাকে বিশ্বাস করে, ভালোবাসে, পছন্দ করে। কোন বিবাদে যখন কেউ কোন সমাধানে পৌঁছাতে পারেনা তখন মুহাম্মাদ (সাঃ) কে সবাই মধ্যস্থতাকারী মেনে নেয়। কারণ তারা জানে মুহাম্মাদ (সাঃ) বেইনসাফ করবেন না।

কিন্তু এই মুহাম্মাদ (সাঃ) ঠিক যেদিন থেকে তাওহিদের কথা বলতে শুরু করলেন, এক আল্লাহর কথা বলতে শুরু করলেন, সমস্ত কিছুর উপরে শুধু মাত্র এক আল্লাহর বড়ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, মালিকানার কথা বলতে শুরু করলেন তখনই তাকে বিভিন্ন ভাবে আক্রমন করা শুরু হল।

প্রথমে তারা হাসি তামাশা উপহাস দিয়ে শুরু করল, এর পরে আস্তে আস্তে তারা রাসুল (সাঃ) পাগল, জাদুকর, পরিবারের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটনকারী, এমন সব জঘন্য অপবাদ দিতে শুরু করল! (নাউজুবিল্লাহ)। এর পরে তারা আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়ে রাসুল (সাঃ) কে হত্যা করে ফেলার পরিকল্পনা করল। এর কারণ ছিলো যদি মুহাম্মাদ (সাঃ) জীবিত থাকেন তবে কাফেরদের বাপ দাদার দ্বীন/ধর্ম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ তাঁর রাসুল কে নিরাপদে মক্কা থেকে বের করে নিয়ে গেলেন। এর পরে মদিনাতে যাবার পরেও কাফের রা বদর প্রান্তে জমায়েত হয়েছিলো এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে, ইসলাম এবং মুহাম্মাদ (সাঃ) কে দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিবে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওতায়ালা রাসুল (সাঃ) কে সান্তনা দিয়ে বলছেন, (ভাবার্থে) - তাদের শত্রুতা আপনার সাথে নয় বরং তাদের শত্রুতা তো আল্লাহর দ্বীনের সাথে, অর্থাৎ আমি আপনার কাছে যে ওহী/মেসেজ পাঠিয়েছি এটির সাথে তাদের শত্রুতা। যেহেতু তারা এই মেসেজ বা ওহির সাথে সরাসরি কিছু করতে পারছেনা তাই এই ওহীর সাথে শত্রুতার উদ্দেশ্যেই তারা আপনার সাথে শত্রুতা করছে।

আমি আপনাদের বলব, সতর্কতার সাথে লক্ষ্য করেন কি ভাবে ঘটনা গুলো ঘটে, কারণ একটু পরেই আমি রাসুল (সাঃ) এর এই ১৫০০ বছর আগের ঘটনার মত আরেকটি ঘটনা বলব, যা আমদের বর্তমান সময়ের। আমাদের সবচেয়ে বড় ভুল আমরা অতীত থেকে শিক্ষা নেইনা!

এবার চলে আসি হাল আমলে। আপনারা হয়ত বিডিএস মুভমেন্ট এর নাম অনেকেই শুনেছেন। এটি মূলত দখলদার জায়নবাদী ইহুদীদের জুলুমদের প্রতিবাদে বিশ্বব্যাপী ইজরায়েল কে বয়কট এর আন্দোলন। এই আন্দোলন জায়নবাদী ইজরায়েলের সবচেয়ে বড় ভীতির কারণ ছিলো। আল্লাহ চাইলে ইনশাআল্লাহ সামনে কোনদিন সেই ব্যাপারে আলোচনা হবে। পয়েন্ট হচ্ছে ইহুদিরা এই বিডিএস মুভমেন্ট এর বিরুদ্ধে রীতিমত যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছিলো। সাইকোলজিক্যাল ওয়ার। এই যুদ্ধে তাদের একটি মেইন স্লোগান ছিলো - সেটি হচ্ছে

You discredit the messenger as a way of discredit the messege. - তুমি মেসেজ কে হেয়/তুচ্ছ করার জন্য মেসেঞ্জার কে হেয়/তুচ্ছ কর।

বিডিএস মুভমেন্টের যে মেসেজ তা খুবই সত্য, যে কোন সুস্থ বিবেকবান মানুষের কাছে এর সত্যতা এবং যৌক্তিকতা খুব পরিষ্কার। অ্যান্টি বিডিএস মুভমেন্ট কিংবা প্রো ইজরায়েল, জায়নবাদী মুভমেন্ট প্রথম থেকেই জানত তারা কখনই নীতিগত ভাবে এই সত্যতা কে খন্ডন করতে পারবেনা। তাহলে কি করা! যেহেতু বিডিএস মুভমেন্টের মেসেজের সত্যতা কে খন্ডন করা যাচ্ছেনা তাই এই মেসেজের মেসেঞ্জার দেরকে খলনায়ক বানিয়ে দাও। তাদেরকে টেরোরিস্ট উপাধি দিয়ে দাও। [অনেক বড় গল্প, যারা আগ্রহী তারা ইউটিউবে আল জাজিরার ডকুমেন্টারি আছে - The Lobby USA part ১,২,৩,৪ এগুলো দেখে নিতে পারেন]

এবার চলেন হাল আমলে একেবারে নিজের দেশের মাটিতে –

দেশের মানুষ প্রথম যখন একটি শব্দ শুনলো - জঙ্গি, তখন তারা আসলে এই শব্দটির সাথে খুব বেশি জড়িত হয়নি, বা বলা যায় সে সুযোগ পায়নি। হ্যাঁ, দীর্ঘ দিন থেকে টেরোরিস্ট, জঙ্গি এই শব্দ গুলো শুনে এসেছে এটা ঠিক, কিন্তু এগুলো সাধারন জনগনের উপরে তেমন কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। কারণ তখনো এই ট্যাগ গুলো অনেকটা ইরাক, আফগান টাইপ মনে হত। কিন্তু তাগুতের মাথারা

বুঝতে পারলো এখন এই ট্যাগ কে দেশে আমদানি করতে হবে। **বিশ্বাস করেন এই যে আমি বললাম "এই ট্যাগ কে আমদানি করতে হবে" আমি এটা মোটেও কোন মেটাফোরিক উদাহরন হিসেবে বলিনি, বরং আপনি বিশ্বাস করেন সারা দুনিয়াতেই এই ট্রেড চলে। "কনসেপ্ট অফ টেরোরিজম" এর এখন এত বিশাল উপযোগিতা আছে যে তা রীতিমত থিঙ্ক ট্যাঙ্কদের গবেষণার বিষয়!** যাই হোক, দেশে পরিচিত হল একটি ট্যাগ - "জঙ্গি"। এরপরে জনগণের সামনে এই জঙ্গি ট্যাগ কে বদ্ধমূল করার জন্য নাটক সিনেমার কোন অভাব ছিলোনা। অবশেষে জনগণ মেনে নিলো "জঙ্গি" বিষয় টা।

তবে এই গল্পে আমি যে দৃশ্য আপনাদের দেখাতে চাই সেটা একটু ভিন্ন। **আপনি বা আমি যখন সাধারন জনগণ, তখন আমরা উপর থেকে যা শুনি, একটা বিশাল সিস্টেম, সমাজ ব্যাবস্থা যা প্রচার করে তখন আমরা সেটা নিয়ে প্রশ্ন খুব কমই করি, কারণ অনুগত দাস রা প্রশ্ন কম করে, আর আমরা খুব ভালো অনুগত দাস হয়ে থাকার চেস্টা করি, কারণ সেটা করতে পারলেই আমার এবং আমার পরিবারের স্বার্থ রক্ষা হয়, বাকি সব গোল্লায় যাক এমনকি যদি এর জন্য আমাকে দাসত্বের শিকল গলায় পরতে হয়!** কিভাবে? সে গল্প না হয় আরেক দিন করা যাবে ইনশাআল্লাহ। এই সিস্টেমের অনুগত দাস হিসেবে আমরা প্রশ্ন খুব কম করি, আর সেক্ষেত্রে এমন কাউকে খুজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব যিনি এই কাজের পিছনে উদ্দেশ্য কি তা জানার চেষ্টা করবেন!

আমি আপনাদের আজ সেই উদ্দেশ্য টাই দেখাতে চাই এবং সাথে এটাও কিভাবে হাজার হাজার বছর ধরে ইতিহাস আমাদের সামনে দিয়ে ঘুরতে থাকে কিন্তু আমরা শিক্ষা নেইনা!

কথা হচ্ছিলো জঙ্গি নিয়ে। আসেন দেখা যাক এই জঙ্গিরা কি বলে? এই জঙ্গিরা যা বলে তা এক লাইনে যদি আমি বলতে চাই তবে সেটা হচ্ছে, দুনিয়া আল্লাহর, এখানে মালিকানাও চলবে শুধু মাত্র আল্লাহর। আল্লাহর বান্দাদের উপরে কারো কোন নিজের মনগড়া মতবাদের ভিত্তিতে মালিকানা চলবেনা। শুধু মাত্র আল্লাহর আইনই চলবে, অন্য কারো নয়। এটাই হতে হবে, অন্য কিছু নয়।

কোন মিল খুজে পাচ্ছেন? সেই ১৫০০ বছর আগে যখন এই কথাই বলা হয়েছিলো, মক্কার কাফেররা খুব রাগ করেছিলো। কারণ এটা মেনে নিলে তো আর

তাদের শাসন শোষণ থাকেনা। মক্কার কাফেররা এই কারণে মূর্তি পুজা করত না, যে মূর্তি গুলো দেখতে খুব সুন্দর ছিলো বরং আপনি বিশ্বাস করেন তাদের এই মূর্তি পূজা প্রথার পিছনে অনেক বড় কারণ ছিলো, এই প্রথা থেকে, এই প্রথাকে দেখিয়ে, এই প্রথার দোহাই দিয়ে অন্যান্য এলাকার মানুষের থেকে তারা প্রচুর কামাই করতে পারত! এখন আপনি যখন বলবেন, আল্লাহর হুকুম ছাড়া আর কোন হুকুম চলবেনা, তাহলে হাসিনার কি হবে! তার গুন্ডা বাহিনীর কি হবে! আপনি যদি জঙ্গির কথা মেনে নেন তাহলে জঙ্গির সাথে আর কোন বুঝা পড়া নাই। হায়! তাহলে আমাদের বীরপুরুষ বাহিনীর কি হবে! এবার আপনিই বলেন তারা কি এমন কথা মানতে পারে? না কক্ষনোই না! কিন্তু তারা তো আল্লাহর এই কথাকে কোন ভাবে মাটি চাপা দিয়ে নিঃশেষ করে দিতে পারবেনা। ১৫০০ বছরেও কেউ পারেনি! তাহলে কি করা?

মেসেজ কে তো কোন কিছু করা যাচ্ছেনা, তাহলে করনীয় কি? করনীয় সেই ১৫০০ বছর আগের মতই। **মেসেঞ্জার কে আঘাত কর। যে কেউই আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়নের কথা বলে তাকেই জঙ্গি বানিয়ে দাও।** যে কেউ হাসিনার আদর্শের সাথে মিলবেনা সেইই জঙ্গি, এর উদাহরন আপনারা সবাই নিউজ দেখেছেন। এমনকি নিরাপদ সড়কের জন্য আন্দোলন করলেও হাসিনা জঙ্গির গন্ধ পায়! নিউজে যেসব জঙ্গিদের প্রোফাইল আপনারা দেখেছেন জঙ্গি উপাধি পাবার আগ পর্যন্ত কেউ কোনদিন কাউকে আঘাত করেনি, চুরি ডাকাতি করেনি, বখাটেদের মত কোন নারীকে উত্যক্ত করেনি, কোন ক্লাবে, বারে গিয়ে মাতাল হয়ে বেলেল্লাপনা করেনি। বরং সবাই তাদেরকে ভদ্র, শান্ত হিসেবেই স্বীকৃত দিয়ে আসছিলো। কিন্তু ঠিক যে মুহূর্তে সমস্ত তাগুতি বিধানকে চ্যালেঞ্জ করে আল্লাহর বিধানের কথা বলা শুরু করল, সাথে সাথেই সে তাগুতের বিধানের জন্য হুমকি হয়ে গেল! এখন তাগুতের পক্ষে সরাসরি সম্ভব নয় সাথে সাথেই এই ছেলেকে এই কারণে ধরে নিয়ে যাবে যে শুধু বলে -হাসিনা তোমার বিধান মানিনা, আল্লাহর বিধান চলবে। কিন্তু তাই বলে হাসিনা তাকে ছেড়েও দিতে পারেনা! তাহলে তাকে জঙ্গি বানিয়ে দাও। একবার যখন সে জঙ্গি উপাধি পেয়েই গেছে এবার তাকে নিয়ে যা ইচ্ছা তাই করা যাবে।

জঙ্গি যুগের প্রথম দিকে সমস্ত জঙ্গি শুধু মাত্র মাদ্রসাতেই তৈরি হত, অন্তত এমনটাই হাসিনা বাহিনীর দাবি ছিলো। মাদ্রাসা গুলো জঙ্গি তৈরির কারখানা!

নিশ্চয়ই আপনারা ভুলে যাননি। কেন মাদ্রসার উপরে এই আক্রমন? কারণ অন্তত এই মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যাবস্থা এমন কিছু কথা বলে যা তাগুতি সিস্টেমের জন্য হুমকি। কিন্তু যখন এই মাদ্রাসা গুলো তাগুতি সিস্টেমের অধীনে চলে আসলো তখন কিন্তু সেখানে আর একটা জঙ্গিও নাই, বরং তখন জঙ্গি তৈরির ফ্যাক্টরি হয়ে গেলো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি গুলো! কি অদ্ভুত তাই না!

পর্দার পেছনের কথা গুলো হচ্ছে –

তাগুতের সাথে আপনার শত্রুতা এইজন্য যে - আপনি তার জুলুমের মসনদ ধসিয়ে দেয়ার হুমকি দিয়েছেন! আর এজন্যই আপনি আজ জঙ্গি, এজন্যই জঙ্গিদের সাথে তাদের যত যুদ্ধ। তাদের এই যুদ্ধ আসলে আল্লাহর দ্বীনের সাথে কিন্তু যা প্রকাশ্য ভাবে সামনে উপস্থাপন করার সাহস তাদের নাই!

পরিচিত মনে হচ্ছে? ১৫০০ বছর আগের সেই মক্কার কাফেরদের জঘন্য নকশা!

আর হ্যাঁ, একটা শেষ কথা, **আল্লাহ কাফেরদের চক্রান্ত নস্যাৎ করেই ছাড়বেন, আর সবশেষে জাহান্নামেই তাদের কে একত্রিত করা হবে।**

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১৪৫৩

রুপপুর পারমাণবিক প্রকল্প এবং ভারতের নীল নকশা!

s_forayeji

Moderator

১১-০৬-২০১৮

রুপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র - স্বার্থ কার?

মূল প্রসঙ্গে যাবার আগে একটু ভুমিকা সেরে নেই। ইকোনমিক হিট ম্যান জন পারকিন্স তার বই "কনফেশন অফ এ ইকোনিক হিটম্যান" এ কিছু বিষয় উল্লেখ করেছেন। যার মধ্যে একটি হচ্ছে কিভাবে শোষক শ্রেণী দরিদ্র বা উন্নয়নশীল দেশ গুলো থেকে সুবিধা নেয়। সংক্ষেপে সেই ফর্মুলা টা হচ্ছে এমন যে,

ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বা এমন দাদা টাইপের কেউ কোন দরিদ্র বা উন্নয়নশীল দেশকে (যাদের কে আমরা থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি বলে বেশি চিনি) বিপুল পরিমানে লোন দিবে বিভিন্ন বড় বড় ইনফ্রাস্ট্রাকচার করার জন্য, যেমন পাওয়ার প্লান্ট, এনার্জি সেক্টর, তেল কিংবা গ্যাস, এরকম। এরপরে তারা এই লোনের সাথে এমন সব শর্ত জুড়ে দিবে যে বাস্তবে এই লোনের পুরা কিংবা সিংহভাগ টাকা আবার তাদের কাছেই ফিরে যাবে। এটা হবে এই ভাবে যে, এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য তাদেরই পছন্দ অনুযায়ী কোম্পানি নিয়োগ দিতে হবে, তাদের পছন্দ অনুযায়ী সরবরাহকারী থেকে কাচামাল নিতে হবে। এই ভাবে এই টাকা বাস্তবে আবার ঘুরে বিশ্ব ব্যাংক কিংবা তার স্বার্থ রক্ষা কারীদের হাতে গিয়েই পৌছায়। এখানেই শেষ নয়। বরং এরপরে এই ফ্যাসিলিটি থেকে অধিকাংশ সুবিধা তারাই আগে নিয়ে নেয় এবং তাদের পছন্দ মত দামে এটার কেনা বেচা করতে বাধ্য করে। এভাবে দিন শেষে যখন হিসাবের খাতা খুলে বসা হয় তখন দেখা যায় - বিশ্বব্যাংক এই সব হতভাগা দেশের সামনে বিশাল এক মুলা ঝুলিয়ে সর্বস্ব লুটে নিয়ে সেই দেশের হতভাগা জনগনের উপরে এক বিশাল ঋণের বোঝা চাপিয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, ফ্রিতে দিয়ে যায় পরিবেশ বিপর্যয় কিংবা স্বাস্থ্য ঝুঁকি সম্পন্ন কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়।

আবারও বলি এটা আমার কথা না, জন পারকিন্স এর কথা। এই পুরা ফর্মুলায় জন পারকিন্স দের মত হিটম্যানদের কাজ কি? তাদের কাজ হচ্ছে সেই হতভাগা দেশকে এটা বিশ্বাস করানো যে - তোমার দেশ এবং জাতির উন্নতির জন্য এর

চেয়ে সুন্দর আর কোন অফার হতেই পারেনা। তবে বাস্তবতা আসলে আরেকটু তিক্ত। কারণ এই কেনাবেচা টা আসলে এত সরল নয় - বরং এই কেনা বেচা তা হয় মূলত দুই ভাবে।

১। সেই দেশের নেতাকে বা নেতাদেরকে (যারা এই সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখে) তাদের কে অর্থের মাধ্যমে কিনে নেয়া হয়।

২। সামরিক, বেসামরিক, কূটনৈতিক হুমকির মাধ্যমে।

জন পারকিন্স এর মতে এমন একটি ম্যাসিভ ইকোনকিম স্যাবোটাজ কে কিভাবে চিনতে পারা যায়? উত্তর হচ্ছে যখন আপনি দেখবেন উন্নয়নশীল বা সল্পন্নোত দেশ গুলোতে এরকম বিশাল আকারের প্রজেক্ট গুলো শুরু হচ্ছে। যার মধ্যে একটি হচ্ছে পাওয়ার/এনার্জি। যেখানে সেই দেশের জন্য এত বিশাল কলেবরের পাওয়ার বা এনার্জি আপাতত কোন দরকার নাই কিংবা এরক্ম মেগা প্রজেক্ট চালানোর মত সামর্থ্য, দক্ষ জনবল বা অন্যান্য উপাদান সমুহ অনুপস্থিত। এবং এই পুরা নাটকে সাধারন জনগনের সম্পর্কিত থাকার কোন সুযোগ তো অনেক দুরের কথা তাদের সামনে এই ব্যাপারে কোন সঠিক তথ্য বা ধারনাই থাকেনা।

কাকতালীয় ভাবে! আমাদের টপিকটিও পাওয়ার নিয়ে। রুপপুর পারমাণবিক প্রকল্প। প্রশ্ন হচ্ছে এটাও কি কাকতালীয় যে, স্যাবোটাজের ২য় লক্ষনও এখানে উপস্থিত। দেশের জনগন এই ব্যাপারে কিছুই জানে না। দেশের জনগণ তো অনেক দুরের কথা এই ব্যাপারে বিজ্ঞজনেরাই অনেক কিছু জানেন না!

দেখা যাক - এটি একটি ইকোনমিক স্যাবোটাজ কিনা? কার স্বার্থ রক্ষা হচ্ছে এই প্রকল্পে? বাংলাদেশের মাটি ব্যাবহার করে এই দেশের জনগণের সামনে পারমাণবিক বিপর্যয়ের মত বিশাল ঝুঁকিকে সামনে রেখে, এই দেশের জনগণের অর্থ দিয়ে বাস্তবে কার সার্থ রক্ষা করার কাজ চলছে?

এই বিশাল চক্রান্তের জটিলতা এমনকি বিজ্ঞজনের কাছেই পরিষ্কার না! তাই আমরা খুব সহজ ভাবে আমাদের মত সাধারন মানুষের জন্য বোধগম্য হয় এমন বিষয় গুলোই শুধু দেখব। আমি নিজে থেকে তেমন কোন কথাই বলবনা, বরং দেশের এক নম্বর দৈনিক নিউজপেপার প্রথম আলোর প্রতিবেদন এবং পরমানু বিশেষজ্ঞদের মতামত গুলোই আপনাদের সামনে তুলে ধরব।

পাবনার রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিভিন্ন পর্যায়ের লোকবল প্রশিক্ষণ নিচ্ছে ভারতের নিউক্লিয়ার পাওয়ার করপোরেশন অব ইন্ডিয়ায় (এনপিসিআইএল)। গত জুলাই পর্যন্ত তিনটি ব্যাচে মোট ১৪৩ জন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। সর্বশেষ ব্যাচে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ছিলেন ৫৫ জন। (প্রথম আলো)

এই ব্যাপারে বাংলাদেশ পরমানু শক্তি কমিশনের সাবেক প্রধান প্রকৌশলী, আব্দুল মতিন সাহেব বলেন –

আমরা জনবলের বিষয়ে বিশেষ জোর দিলেও সরকার সেটা উপলব্ধি করতে পারেনি। জনবল বলতে আমরা কী বোঝাই, সেটা বোঝা দরকার। জনবল মানে রিঅ্যাক্টর অপারেটর নয়। অনেকে মনে করেন যে এখন তো আমরা প্রশিক্ষণে পাঠাচ্ছি। তার মধ্য দিয়ে জনবল তৈরি হচ্ছে। কিন্তু এটাই পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জনবল নয়। আইএইএর গাইড বইয়ে আছে, আমরা যে সময় পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র করতে চাই তার অন্তত ১০ বছর আগে আমাকে জনবল তৈরি করতে হবে। এই জনবল পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র-সংক্রান্ত নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্তগুলো নেবে। এই সিদ্ধান্ত ভুল হলে তা কিন্তু আর শোধরানোর সুযোগ নেই। আইএইএর গাইড বই অনুসারে, যারা এ সিদ্ধান্ত নেবেন তাদের মধ্যে এমন কয়েকজন থাকতে হবে, পরমাণু প্রযুক্তি সম্পর্কে যাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা চুল্লি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞদের সমপর্যায়ের। যেহেতু জনবলের এই বিষয়টা আমরা বুঝিনি, সেহেতু আমাদের অনেক খেসারত দেওয়ার আশঙ্কা আছে।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, গত বছরে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে করা পরমাণু সহযোগিতা চুক্তির আওতায় এখন শুধু লোকবল প্রশিক্ষণের পর্যায় রয়েছে। ভবিষ্যতে রূপপুর পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের বিভিন্ন পর্যায়ে ভারত অংশ নেবে। এর আগে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ, লোকবল প্রশিক্ষণ ও কেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্ব রাশিয়ার কাছে ছিল। এ বিষয়ে রাশিয়ার সঙ্গেও একটি চুক্তি রয়েছে বাংলাদেশের। এখন এ প্রকল্পের রাশিয়ার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হচ্ছে ভারত। আগে বলা হয়েছিল, এই প্রকল্পে ভারতের কাছ থেকে পরামর্শ সেবা নেওয়া হবে, প্রকল্পের জনবল প্রশিক্ষণে তারা সহায়তা দেবে। (প্রথম আলো)

অথচ মজার ব্যাপার হচ্ছে –

ভারতের পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো রাশিয়ারই প্রযুক্তিগত সহায়তায় তৈরি। নিজ দেশে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের রি–অ্যাক্টর থেকে শুরু করে প্রায় সবকিছুর জন্য ভারত রাশিয়ার ওপর নির্ভরশীল। নিজের দেশের কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণের বাইরে বিশ্বের কোথাও পারমাণবিক কেন্দ্র নির্মাণে ভারতের কোনো অভিজ্ঞতা নেই। (প্রথম আলো)

কিন্তু সেই ভারত আমাদের দক্ষ জনবল তৈরির প্রশিক্ষনের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজের মাস্টার মশাই!

কূটনৈতিক সূত্র ও পরমাণু বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ভারত মনে করে, প্রতিবেশী কোনো দেশ সামরিকভাবে শক্তিশালী হলে তা হবে তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। সে কারণে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র যাতে ভবিষ্যতে কোনোভাবেই সামরিক কাজে ব্যবহৃত না হয়, তা নিশ্চিত করতে চায় দেশটি। (প্রথম আলো)

তার মানে - আমার দেশে আমার জনগণের টাকা দিয়ে কি করা হবে আর কি করা হবে না তা দাদা মশাই ঠিক করে দিবেন! খুবই সঙ্গত কথা, যত যাই হোক - স্বাধীন দেশ বলে কথা!

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্পে ভারতের আগ্রহের আরেকটি কারণ, ভারত বহুদিন ধরে নিউক্লিয়ার সাপ্লায়ার্স গ্রুপের (এনএসজি) সদস্যপদ পেতে চেষ্টা করছে। ৪৯টি দেশের এ জোটে ভারত ঢুকতে পারছে না চীনের বাধার কারণে। ভারত এনএসজিতে ঢুকলে পরমাণু পণ্য ও প্রযুক্তি খাতে লাখো কোটি টাকার বাজারে ঢুকতে পারবে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে যুক্ত হতে পারলে তাদের সে পথ সুগম হবে। কারণ, বাংলাদেশের রূপপুরই ভারতের বাইরে তাদের এ ধরনের কোনো প্রকল্পে প্রথম যুক্ত হওয়া (প্রথম আলো)

জন পারকিন্স এর প্রথম শর্ত সুপস্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে - এখানে অন্য কারো স্বার্থ রক্ষা করাই মূল উদ্দেশ্য এবং তা সম্ভাব্য সব দিক দিয়ে। বাংলাদেশের সাথে রাশিয়ার সম্পর্ক কখনই ভারতের সাথে রাশিয়ার সম্পর্কের চেয়ে বেশি নয়!

রূপপুর আমাদের প্রায় ৫০ বছরের স্বপ্ন। এখন সেই প্রকল্প বাস্তবের মুখোমুখি। আমরা এগিয়ে গেছি। কিন্তু এত বিশাল প্রকল্পের যে ব্যয় তার ৯০ শতাংশই ঋণের টাকা। কাজেই আমাদের ঋণের দায় অনেক বাড়বে। - রেজাউর রহমান : সাবেক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন।

জন পারকিন্সের কথার আরো বিস্তারিত বিবরণ আরো সুস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে! বিশাল ঋণের বোঝা সাধারন জনগণকেই বহন করতে হবে।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রকল্প পরিচালক মো. শৌকত আকবরের সঙ্গে দেখা করার জন্য সময় চেয়ে একাধিকবার তাঁর মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হয়। খুদে বার্তাও পাঠানো হয়। তবে তিনি সাড়া দেননি। এরপরও গত মার্চ মাস থেকে একাধিকবার তাঁর সঙ্গে দেখা করে কথা বলার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু তিনি দেখা করেননি। ফলে ভারতের সঙ্গে চুক্তির পর যেসব অস্পষ্টতা তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে, সেসব বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকের কোনো মতামত জানা সম্ভব হয়নি। (প্রথম আলো)

২০১১ সালে রাশিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের চুক্তি অনুযায়ী, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের সব দায়িত্ব রাশিয়ার হাতে থাকবে। কিন্তু বাংলাদেশ-রাশিয়া-ভারতের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় চুক্তির ফলে রূপপুরে নির্দিষ্টভাবে রাশিয়া ও ভারতের ভূমিকা কোথায় কীভাবে থাকবে, তা নিয়ে অস্পষ্টতা তৈরি হয়েছে। (প্রথম আলো)
তবে বাংলাদেশ-ভারত চুক্তি বিশ্লেষণ করে জানা গেছে, চুক্তির কোথাও কেন্দ্রে বিপর্যয় হলে কে দায় নেবে, সেটা স্পষ্ট নেই। (প্রথম আলো)

কেন্দ্রের সবকিছুই যখন ভারত করবে, তাহলে পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রের স্পেন্ট নিউক্লিয়ার ফুয়েল বা ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি কে নেবে, সে ব্যাপারেও অস্পষ্টতা তৈরি হয়েছে। (প্রথম আলো)

এই হিসাব অনুযায়ী, রূপপুরের ব্যয় প্রতি কিলোওয়াটে চার হাজার ডলারের বেশি হতে পারে না। সেখানে সাড়ে পাঁচ হাজার ডলার কেন হলো সেটা আমি বুঝতে পারছি না। - আবদুল মতিন : সাবেক প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন।
রূপপুরের পারমাণবিক বর্জ্য রাশিয়ার নিতে হলে তাদের সংসদে আইন সংশোধন

করতে হবে। সেটা তারা করবে কি না আমি জানি না - আবদুল মতিন : সাবেক প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন।

- ২য় শর্তও পূরণ হয়ে যাচ্ছে - বিজ্ঞ ব্যক্তিরাই জানেন না কি হচ্ছে!

এবার আসি - উপসংহারে –

২০১২ সালের জুলাইয়ে ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশন একটি অনুরোধপত্র (নোট ভারবাল) পাঠায় বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে। এতে ভারত রূপপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্পে যুক্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। এরপর তিন বছর বিষয়টি নিয়ে ঢাকা ও দিল্লিতে তো বটেই, এর বাইরে রাশিয়ায় সরকারের উচ্চপর্যায়ের নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে আলোচনা হয়। (প্রথম আলো)

এটা খুবই দুঃখজনক যে রাশিয়া ভারতকে কেন্দ্রের যন্ত্রপাতি সরবরাহের সাব-কন্ট্রাক্টের (উপঠিকাদারি) কাজটি দিয়েছে। অথচ ভারতের ভিভিইআর রি–অ্যাক্টরে যন্ত্রপাতি উৎপাদনের কোনো অভিজ্ঞতাই নেই। ভারত তার নিজের পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র কুদানকুলামের জন্য যন্ত্রপাতি রাশিয়া থেকে আমদানি করেছে। তিনি বলেন, 'অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, ভারত রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে সর্বোচ্চ মুনাফা করতে চায়।' - আবদুল মতিন : সাবেক প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন।

'ভারতের সঙ্গে সহযোগিতা চুক্তিতেই এমনটি রয়েছে' জানালে ইয়াফেস ওসমান বলেন, 'ভারত আমাদের বন্ধু, প্রতিবেশী দেশ। আমরা শুধু ভারতের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাটুকু নেব। এর বাইরে কোনো সেবা নেব না।' তাহলে চুক্তি নিয়ে পরে কোনো সংকট তৈরি হবে কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, 'ভারত তো শত্রুরাষ্ট্র না, আমাদের বন্ধুরাষ্ট্র।' - (প্রথম আলো)

- প্রত্যেকটি বিষয় যখন অস্পষ্ট এবং কারও মুখ থেকে কোন স্পষ্ট ব্যাখ্যা নাই, জনগণের উপরে বিশাল দেনার বোঝা এবং পারমাণবিক বিপর্যয়ের মত ঝুকির মুখে জনগণ কে জিম্মি করে যখন একথা টি তারা কোন দ্বিধা ছাড়াই স্পস্ট ভাবে উচ্চারন করতে পারেন - 'ভারত তো শত্রুরাষ্ট্র না, আমাদের বন্ধুরাষ্ট্র –

তখন আমাদের সামনে একটি প্রশ্নই আসে, তাহলে এই প্রকল্প কার স্বার্থ রক্ষার কাজ করছে? এই প্রকল্পে বাংলাদেশ এবং এই দেশের জনগনের স্বার্থের বিষয় টি

কেউই পরিষ্কার করে এখনো দেখাতে পারলেন না, এমন কি বড় বড় পরমানুবিদ গন ও না। এমন অবস্থায় ভারতের সুপস্ট স্বার্থ রক্ষার তাগিদে যখন ভারতকে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ ও পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হবে এই কথার ব্যাপারে দায়িত্বশীল দের কাছে প্রশ্ন করা হয় তখন তারা **'ভারত তো শত্রুরাষ্ট্র না, আমাদের বন্ধুরাষ্ট্র** - এই বলে উত্তর সারেন।

তাহলে এই ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকার অবকাশ নাই যে, রুপপুর পারমাণবিক প্রকল্পে বাঙ্গালদেশের জনগণের অর্থে এদেশের মাটি এবং জনগন কে পারমাণবিক বিপর্জয়ের মত ঝুকির সামনে ফেলে দিয়ে এ সরকার চরম অনুগত দাসের মত শুধু তথা কথিত দাবি কৃত বন্ধু রাষ্ট্র ভারতের স্বার্থ রক্ষার করার লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছে।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১৪১৫

সফলতা কোথায়???

ফানা ফিল্লাহ

Member

১১-১৫-২০১৮

জীবনের সফলতা কি?

মাওলানা আসেম উমর হাফিযাহুল্লাহ

- জীবনের সফলতার মানে যদি হয়, টাকা পয়সা উপার্জন করা তাহলে শহিদকে যে ধনসম্পদ দেয়া হবে তার তুলনায় দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ মাছির পাখার সমানও - নয়।

- যদি সফলতা উন্নত মানের খাবারদাবারের নাম হয়ে থাকে-, তবে শহিদদের মেহমানদারী মাছ দিয়ে করা হবে।

- যদি সফলতা সুন্দর সুন্দর ঘর বাড়ি বানানো হয়ে থাকে, তবে শহিদ কে এমন ঘর দেয়া হবে যেটার ব্যাপারে রাসুল সঃ বলেছেনঃশহিদের জন্য এমন ঘর রয়েছে যার প্রশস্থতা ইয়ামানের সানাআ শহর থেকে শামের জাবিয়্যাহ শহর পর্যন্ত। যেটা বানানো হয়েছে বাহিরে হীরা ও ইয়াকুত দিয়ে এবং ভেতরে মিস্ক ও কাফুর দিয়ে।
- যদি সফলতা সুন্দরী রমণীকে বিয়ে করা হয়ে থাকে, তবে এক্ষেত্রেও শহিদের মোকাবেলা দুনিয়ার কোন মানুস করতে পারবে?

- যে কেউ শহিদ হওয়ার সাথে সাথেই জান্নাতের ২ হুর জান্নাত থেকে ১০০ জোড়া পোষাক নিয়ে শহিদের কাছে পৌছে যায় এবং তার চেহারায় হাত বুলিয়ে তার আগমনের সুসংবাদ শোনায়। এমন হুর যাদীর সৌন্দর্য ম্লান হয়ে- যাবে যাকে দেখে পুর্নিমার চাদও শরম পাবে।

- যদি সফলতা এটা হয় যে, সন্তান পিতা মাতা নিজ পরিবারের ও আত্মীয় স্বজনের কাজে আসবে, তবে শহিদ কিয়ামতের দিন নিজের পিতা মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের উপকারে আসবে যেদিন কেউ কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করবেনা ।মানুষ নিজের ঘামে ডুবে এক নেকির সন্ধানে নিজের আত্মিয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের কাছে - ধরনা দিতে থাকবে। ঐ দিন শহিদ সেসব আত্মীয়স্বজনের কাজে আসবে যাদএর

ব্যাপারে জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেছে। মদিনার সর্দার নবী সঃ ইরশাদ করেন ঃঃ শহিদ নিজের আত্মীয়স্বজনের থেকে ৭০ জনের সুপারিশ করবে।

- জীবনের সফলতা আসলে কী?

- এটাই সবচেয়ে সফল জীবন যে, এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তরুনদের অন্তর ছোট ছোট জিনিসের মধ্যে আটকে থাকে না। তারা সবকিছুকে পিছনে রেখে সবচেয়ে উচু জিনিসকে নির্বাচন করে।

- না দুনিয়ার ধনসম্পদ এদের দৃষ্টি কাড়ে-, না দুনিয়ার যশখ্যাতি তাদের- প্রভাবিত করে, না এসব যুবকদের মনে বেপরোয়া আকর্ষন প্রভাব বিস্তার করে, না দুনিয়ার মোহ এদের প্রলোদ্ব করতে পারে?

বরঞ্চ তাদের অন্তর চিরস্থায়ী জান্নাতের নেয়ামত সমুহের প্রতি লেগে থাকে। যেখানকার সম্মানের কোন তুলনা নাই, যেখানকার সৌন্দর্য কখনো মলিন হবে না, যেখানে জীবনের স্থায়িত্ব সর্বদা যৌবনের শীর্ষে থাকবে, না কোন দুঃখদুর্দশা- তাদের স্পর্শ করবে, যেখানে সব কিছু থাকবে যা কোণ অন্তর তামান্না করতে পারে ,যেখানে সব মনোবাসনা পূর্ণ করা হবে যা কোন অন্তর চাইতে পারে, যেগুলো বাস্তবতার রুপ ধারন করবে।

জগতের প্রতি পালক ইরশাদ করেনঃ সেখানে তোমাদের জন্য আছে যা তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য আছে যা তোমরা দাবী কর।

তাহলে আপনিই চিন্তা করুন যাদের কাছে সাফল্যের মাপকাঠি এত উচু তাদের কাছে দুনিয়ার জীবনের স্থান কোথায়? যা কি না মাছির ডানা পরিমান ও নয়। যুবক ভায়েরা !!!

নিজেরাই সিদ্বান্ত গ্রহন করুন, কারা জীবনের ব্যাপারে উত্তম পরিকল্পনা গ্রহন করেছে?
কারা নিজেদের বোধশক্তি খাটিয়েছেন? কাদের সংকল্প ও অভিপ্রায় দৃঢ়দৃষ্টি সম্পন্ন? কারা জিবনের বহুভাবনা-র পর্যন্ত গভীরভাবে চিন্তা.....দু- করেছেন? কারা জীবনের সফলতায় পৌছাতে পেরেছেন? আর এটাই মহা সাফল্য।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১৪৯৬

জিহাদী মিডিয়ার গুরুত্ব - শাইখ আবু কাতাদাহ (:হাফি)

s_forayeji

Moderator

১১-২৮-২০১৮

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, সালাম ও শান্তি বর্ষিত হোক রাসূল (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীদের উপর।

আমাদের শায়েখ, বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন আবু ক্বাতাদা, আল্লাহ আপনাকে হেফাজত করুন ও আপনাকে সত্যের উপর অবিচল রাখুন। প্রিয় শায়েখ, শামের যুদ্ধক্ষেত্রগুলোতে আমাদের কিছু ভাই আছেন যারা মিডিয়াতে কাজ করেন। তারা আপনার নিকট কিছু প্রশ্ন করেছেন ও তার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছেন। আল্লাহ আপনাকে ভালো রাখুন।

প্রশ্নসমূহঃ প্রিয় শায়েখ, আল্লাহ আপনাকে হেফাজত করুন আর আপনার উপর সদয় দৃষ্টি রাখুন। আসসালামুআলাইকুম।

(১) এডিটিং (সম্পাদনা), ডিজাইনিং (বিন্যাস ও পরিকল্পনা) ইত্যাদি এর মত মিডিয়ার কাজ যা ঘরে বসে করা হয় তার পুরস্কার কি আল্লাহর রাস্তায় মুরাবিতের (যিনি যুদ্ধে পাহারারত) পুরস্কার সমতুল্য? আর এখানে যা বোঝানো হচ্ছে তা হল, রিবাতের মর্যাদা বর্ণনাকারী হাদিসসমূহ; যেমনঃ "আল্লাহর রাস্তায় একদিনের রিবাত হাযারে আসওয়াদের পাশে ক্বিয়ামূল লাইল অপেক্ষা উত্তম"। আর তাকে যদি এ অবস্থায় হত্যা করা হয় তবে কিয়ামত পর্যন্ত তার আমলনামায় সওয়াব লিখা হবে?

(২) কোন ভাই যদি মিডিয়ার কাজের প্রস্তুতিতে অবহেলা করে তাহলে সে কি গোনাহগার হবে? আর তার অবহেলার কারণে জিহাদবিরোধী মিডিয়া ও তাদের ছাড়া অন্যান্য চরমপন্থী মিডিয়াগুলো কর্তৃত্ব লাভ করে। তাই, এই অবহেলার ফলে বেশ কিছু ভাই এসব ভ্রান্ত চরমপন্থার দিকে আকৃষ্ট হয়, সুতরাং অনেক ভাইই মিডিয়া ও সক্রিয় সামরিক উন্নতির মত ক্ষেত্র থেকে দূরে থাকেন এ কারণে তাদের প্রত্যেকেই কি গোনাহগার হবেন?

শায়েখ, আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন, উত্তরে বলেনঃ

আপনাদের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।

আল্লাহর রাস্তায় নিয়োজিত আমার ভাইয়েরা! জেনে রেখো, ইসলাম ও জাতিসমূহের ইতিহাসে জিহাদ ও কিতালের কাজের মধ্যে সবচেয়ে বড় কাজ সমূহের একটি হচ্ছে মিডিয়ার কাজ। টিকে থাকা ও বিজয়ের ক্ষেত্রে এটা হল সমগ্র কাজের অর্ধেক তুল্য। রাসূল (সাঃ) হাসান (রাঃ) কে উৎসাহিত করেন যেন তিনি মুশরিকদেরকে বিদ্রূপাত্মক বর্ণনার দ্বারা আক্রমণ করেন, কারণ তার এ কাজ তীর নিক্ষেপের চেয়ে অধিক ধ্বংসাত্মক ফল বয়ে আনবে। মুসলিম (রহঃ) তার সহীহাইনে বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসুল (সাঃ) বলেনঃ "কুরাইশ কাফিরদের বিরুদ্ধে বিদ্রূপাত্মক বর্ণনা করো, কারণ তা (বিদ্রূপাত্মক বর্ণনা) তীরের জখম থেকেও অধিক মারাত্মক"।

তাই তিনি ইবনে রাওয়াহাকে পাঠান তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রূপাত্মক বর্ণনা করতে। তখন তিনি একটি ব্যাঙ্গ রচনা করেন যা তাঁর কাছে ভালো লাগেনি। তারপর তিনি (সাঃ) কাব বিন মালিককে একই কাজের জন্য বলেন কিন্তু সেটাও তাকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। তখন তিনি হাসান বিন সাবিতের কাছে কাউকে পাঠান। হাসান বিন সাবিত তাঁর কাছে এসে বলেনঃ আপনি এখন সেই সিংহকে ডেকেছেন যে তার লেজ দিয়ে শত্রুকে আঘাত করে। তারপর তিনি বলতে লাগলেনঃ যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তার কসম, আমি আমার জিহ্বা দ্বারা তাদেরকে এমনভাবে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করবো যেমনভাবে চামড়া বিদীর্ণ করা হয়।

সে কারণে আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বলেনঃ তাড়াহুড়া করোনা; তোমাদের জন্য আমার বংশ সম্পর্কে আবু বকরকে (রাঃ) একটি পার্থক্য নির্ণয় করতে দাও কারণ তাদের ও আমার বংশ একই। আর আবু বকর কুরাইশদের বংশ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞান রাখে। তারপর হাসান তার নিকট (আবু বকর) আসেন ও অনুসন্ধান করার পর (রাসুল সাঃ এর বংশ সম্পর্কে) রাসুল সাঃ এর নিকট আসেন ও বলেনঃ হে আল্লাহর রাসুল! তিনি আপনার বংশ ও কুরাইশদের বংশে একটি পার্থক্য নিরূপণ করেছেন।

যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তার কসম, আমি তাদের থেকে আপনার নামকে এমনভাবে পৃথক করে আনবো যেমনভাবে ময়দা থেকে চুলকে পৃথক করা হয়। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ আমি আল্লাহর রাসুল সাঃ কে হাসানকে বলতে

শুনেছিঃ "যতক্ষণ তোমরা আল্লাহ ও তার রাসুল সাঃ এর পক্ষে থাক ততক্ষণ নিশ্চয়ই রুহুল কুদুস (পবিত্র ফেরেশতা) তোমাদের সাহায্য করতে থাকবে"। আর তিনি (আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ আমি আল্লাহর রাসুল সাঃ কে হাসানকে বলতে শুনেছিঃ হাসান তাদের বিরুদ্ধে ব্যাঙ্গ রচনা করেছে ও মুসলমানদের তৃপ্তি দান করেছে আর কাফিরদের নীরব করেছে।

আর তিনি (সাঃ) উহুদ যুদ্ধের পর উমর আল ফারুক (রাঃ) কে আবু সুফিয়ানের কথার জবাব দিতে নির্দেশ দেন ও জবাবে কি বলবেন তাও শিখিয়ে দেন। বারা ইবনে আযিব এর রেওয়ায়েতে বুখারি তার সহিহাইনে বর্ণনা করেন যেঃ "আমরা সেদিন (উহুদ যুদ্ধের দিন) মুশরিকদের সামনাসামনি হলাম এবং রাসুল সাঃ একটি তীরন্দাজ বাহিনীকে উপযুক্ত স্থানে স্থাপন করলেন ও আব্দুল্লাহকে তাদের সেনাপতি নিযুক্ত করলেন"। আর তিনি বললেনঃ".....আবু সুফিয়ান একটি উঁচু স্থানে অবতরণ করে বলে, "লোকদের সাথে কি মুহাম্মদ উপস্থিত?"

রাসুল সাঃ বলেন, "তার কথার উত্তর দিওনা"। আবু সুফিয়ান আবার বললো, "লোকদের সাথে কি আবু কুহাফার ছেলে উপস্থিত?" রাসুল সাঃ বলেন, "তার কথার উত্তর দিওনা"। আবু সুফিয়ান আবার বললো, "লোকদের সাথে কি আল খাত্তাবের ছেলে উপস্থিত?" রাসুল সাঃ বলেন, "তার কথার উত্তর দিওনা"। আবু সুফিয়ান তখন বললো, "ঐ লোকগুলো মারা গিয়েছে, কারণ তারা যদি বেঁচে থাকতো তবে কথার জবাব দিত"। সেই মুহূর্তে উমর (রাঃ) আর থেমে থাকতে পারলেননা। তিনি বললেনঃ "হে আল্লাহর দুশমন! তুমি মিথ্যা বলেছ, আল্লাহ তা টিকিয়ে দিয়েছেন যা তোমাকে মনোকষ্ট দিবে"। আবু সুফিয়ান বললো, "হুবাল সুউচ্চ হয়েছে"।

তখন রাসুল (সাঃ) বলেনঃ "তার কথার উত্তর দাও"। তারা জিজ্ঞেস করলেনঃ "আমরা কি উত্তর দিব?" তিনি জবাবে বললেনঃ "বল, আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক সুউচ্চ ও গৌরবান্বিত"। আবু সুফিয়ান বললো, আমাদের জন্য রয়েছে উযযা (মূর্তি) আর তোমাদের কোন উযযা নেই"। রাসুল (সাঃ) বলেনঃ "তার কথার উত্তর দাও"। তারা জিজ্ঞেস করলেনঃ "আমরা কি উত্তর দিব?" তিনি জবাবে বললেনঃ "বল, আল্লাহ আমাদের অভিভাবক আর তোমাদের কোন অভিভাবক নেই"। আবু সুফিয়ান বললো, " আজকের দিন হল বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ নেবার

দিন। আর যুদ্ধে বিজয় আসে পর্যায়ক্রমে। তোমরা তোমাদের কিছু নিহত লোককে বিকৃত অবস্থায় পাবে, কিন্তু না আমি তাদের এর আদেশ দিয়েছি আর না আমি এর জন্য দুঃখিত"।

বাস্তবিকই একজন নেতার কাঁধে সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হল, বল প্রয়োগ করে হলেও এমন ব্যক্তিকে নিয়োজিত করা যে তার বক্তৃতার মাধ্যমে সত্যের সমর্থন করবে তেমনিভাবে যেমনভাবে একজন যোদ্ধা তার রাইফেল দ্বারা সত্য প্রতিষ্ঠা করে। আর জিহাদ যদি এই মূল্যবান কাজ করা থেকে মুক্ত থাকত তবে না আমরা আমাদেরকে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরতে পারতাম আর না আমরা যুবকদের জিহাদের কাজে নিয়োজিত করতে পারতাম যারা যুদ্ধক্ষেত্রগুলো পূর্ণ করতো।

মূলত এটা একটি ফরয কাজ যা সংখ্যার যথেষ্টতার উপর নির্ভর করে। জিহাদে নিয়োজিত ব্যক্তিরা যদি এর প্রতি অবহেলা করেন, তাহলে কোন ব্যতিক্রম ছাড়া সবাই গোনাহগার হবেন। এটা জিহাদ ও কিতালের সমতুল্য আর এটা জিহাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। আরবরা সফরের সময় একজন গায়ককে ভাড়া করতো আর আল্লাহর রাসুল (সাঃ) ও তা করেছেন। আর তাই তিনি বলেছেনঃ "হে আনজাশা, কাঁচের পাত্র (অর্থাৎ মহিলা) দ্বারা ধীরে চালাও (উটগুলোকে)"। আনাস বিন মালিকের রেওয়ায়েতে বুখারি বর্ণনা করেন যেঃ "আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এক সফরে ছিলেন। তার সাথে আনজাশা নামে এক কালো কৃতদাস ছিল আর সে গুন গুন করছিল (গান গাচ্ছিল)। তাই রাসুল সাঃ তাকে বলেনঃ "হে আনজাশা! সতর্ক হও, কাঁচের পাত্র (অর্থাৎ মহিলা) বহনকারী উটগুলোকে ধীরে চালাও"।

তাই যদি মানুষ ও পশুর ভ্রমণের সময় তাদেরকে শক্তি যোগায় এমন গান প্রয়োজন হয় তবে জিহাদের জন্য কি তা প্রয়োজন নয় যা তার অন্তরে শক্তি যোগায়। যেমন খবর ও দৃশ্যপট ছড়ানো যার মাধ্যমে অন্তরে মজবুতি আসে আর আত্মাসমূহ আরও সুদৃঢ় হয়?

সুতরাং যিনি যোদ্ধাদের উৎসাহিত ও সমর্থন করেন আর তাদের খবর মুসলমান জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেন যা শুনে তারা আনন্দিত হয় তার পুরস্কারের চেয়ে আর বড় কী পুরস্কার হতে পারে! সত্যিকার অর্থেই মুজাহিদরা তাদের কর্ম ও জ্ঞান দিয়ে যে সকল কাজ করেন তার অনেক সত্যই হারিয়ে যাবে আর তাদের প্রচেষ্টা অদৃশ্য হয়ে যাবে যদি না তাদের পিছনে একদল সত্যবাদী বাহিনী থাকতো যারা

তাদের ব্যাপারে লিখেন ও তাদের সমর্থন করেন। আর আল্লাহর কসম! আমি যদি বলি যে, ময়দানের অনেক মুজাহিদদের থেকে ঐ লোকগুলো বেশি পুরস্কার পাবে তবে না তা অতিরঞ্জন হবে বা না আমি গোনাহগার হব।

মূলত আমাদের অনেক প্রচেষ্টাই বৃথা চলে যাবে ও অন্যদের দ্বারা চুরি হয়ে যাবে যদি না আমাদের মিডিয়া বাহিনী থাকে যারা সেগুলো নথিভুক্ত করবে এবং সত্য ও নিশ্চয়তার সাথে তা ছড়িয়ে দেবে।

আর আমাদের বিরুদ্ধে যেসব মিথ্যা অভিযোগ ছড়ানো হয় তার ব্যাপারে শক্ত জবাব ও এসব তথ্য মানুষকে জানানো ছাড়া তা নির্মূল করা সম্ভব হবেনা।

আর সত্যিকারেই ভ্রান্ত, উদ্ভাবনী ক্ষমতা সম্পন্ন কুফফার মিডিয়ার শক্তি দ্বারা ইসলামের অনেক যুবকই আমাদের থেকে দূরে সরে যাবে।

আর আমরা তাদের কত জনের খালিস দোয়া থেকেই না বঞ্চিত হবো শুধুমাত্র তারা আমাদের খবর না জানার কারণে!

আর অনেক আত্মাই উদ্ভুদ্ধ ও তৃপ্ত হবে যদি মানুষ তাদের খবরে আনন্দিত হয়। আর তাদের অন্তর আরো ত্যাগ, প্রচেষ্টা ও উৎসর্গের জন্য জেগে উঠবে। যখন তারা জানবে যে তাদের প্রচেষ্টাকে সংরক্ষণ করা হচ্ছে আর সত্যবাদী মুজাহিদদের দ্বারা তা গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তখন তাদের আত্মাগুলো শ্রম দিতে, ব্যয় করতে ও সামনে আগাতে উদ্ভুদ্ধ হবে।

বাস্তবতা হল, মিডিয়া যুদ্ধে অলসতা অস্ত্র যুদ্ধে অলসতার চেয়ে ভয়ানক। আর মিডিয়া যুদ্ধের ভুল অস্ত্র যুদ্ধে ভুলের চেয়ে ভয়ানক খারাপ ফলাফল বয়ে আনবে।

আল্লাহর কসম, রাত জেগে যে এ কাজ করে সে অবশ্যই তার সমান যে কিনা রাত জেগে সম্মুখ যুদ্ধে ও যুদ্ধ ক্ষেত্রে তার ভাইদের পাহারা দেয়। আর তার পুরস্কার এর মতই হবে। আর যে সকল আলেমগণ রাত জেগে শরিয়াহ ও দ্বীন সম্পর্কিত কোন বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন সে তার সমান পুরস্কার পাবে। আর সে যদি সচেতনতার সাথে ও আন্তরিকভাবে এ কাজ করতে করতে পুরস্কারের আশা নিয়ে মারা যায়, তবে অবশ্যই তাকে উঠানো হবে তার ভাইদের সাথে যারা মারা গিয়েছিল বোমাবর্ষণে।

আর এমন ব্যক্তির চোখতো সেই চোখের মত যে চোখ মহান আল্লাহর পথে পাহারা দেয়।

আর আমি জিহাদের নেতৃবৃন্দের নিকট উপদেশ হিসেবে বলি যে, যদি কোন ভাইকে এসব কাজে সক্ষম হিসেবে পাওয়া যায়, কিন্তু সে তা উৎকর্ষ ও দক্ষতার সাথে করতে অস্বীকৃতি জানায়, তাকে লড়াইয়ে যেতে বাঁধা দিন, তাকে নিজের খেয়ার খুশির অনুসরণ করতে বাঁধা দিন, কারণ সে যদি এমন কোন কাজ পরিত্যাগ করে যাতে সে দক্ষ এবং তা জিহাদকে লাভবান করে, এবং এমন কাজে যেতে চায় যেখানে তার চেয়ে অন্যরা দক্ষ, তাহলে তা হচ্ছে নিজ খেয়াল খুশির অনুসরণ করা, এটা দ্বীনের জন্য জিহাদ করা নয়।

আর আল্লাহ যেন সবাইকে সেই দিকেই ধাবিত করেন যা তিনি পছন্দ করেন ও যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন।

আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, সবকিছুর প্রতিপালক।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১৬৩০

আসেন, আমরা চিন্তা করে দেখি - যদি আমি ভুল হই!

s_forayeji

Moderator

১২-১১-২০১৮

যত সময় যাবে তত দাগ পরিষ্কার হবে। কিসের দাগ? ঈমান বনাম কুফর এর। সে দাগ কেমন? সেটা কি চোখে দেখা যায়? এপার ওপার এমন কিছু? না সে দাগ আপাত ভাবে চোখে দেখা যায়না, সে দাগ এমন না যে - ঈমান ওয়ালারা দাগের এ পাশে আসো আর কুফর এর দল ওই পাশে যাও।

কিন্তু দাগ পরিষ্কার হচ্ছে, হবে - আল্লাহ ওয়াদা করেছেন **কুফর কে ঈমান থেকে পৃথক করেই ছাড়বেন।** রাসুল সাঃ বলেছেন এমন সময় আসবে মানুষ রাতে মুমিন থাকবে সকালে কাফির হয়ে উঠবে আর দিনে মুমিন থাকবে কিন্তু রাতে কাফির হয়ে যাবে। (আও কামা কলা আলাইহিস সালাম)

প্রশ্ন হচ্ছে - **আমি ঈমানের ভিতরে আছি নাকি কুফর এর ভিতরে আছি? আমি কোন দাগের ভিতরে আছি?** কারণ আল্লাহ আমার কাছে খাস কোন সতর্কবানী পাঠাবেন এমন না। আল্লাহর ফায়সালা আসবে, আর ঐ ফায়সালা আসবে ঈমান এবং কুফর আলাদা হয়ে যাবার পর। এমন ফিতান আসবে যে সামান্য সন্দেহ থাকলেও সে ঝরে যাবে, ফিতনা তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। কেমন ব্যাপার টা? প্রবল স্রোতের বিরুদ্ধে কেউ হয়ত কোন রকম একটা ডাল বা পাথর এর মাথা ধরে টিকে আছে তার ১০০% মনোযোগ সেই দিকেই থাকতে হবে টিকে থাকার দিকে, পাথর কে ধরে রাখার দিকে। এক মুহূর্তের অসতর্কতা তাকে তলিয়ে নিয়ে চলে যাবে। সামান্য স্রোত যদি তাকে ছাড় না দেয় তাহলে দাজ্জালের ফিতনা আমাদের কে ছাড় দিয়ে দিবে বা আমরা দাজ্জালের ফিতনাকে সামাল দিয়ে নিজেদের ঈমান কে ঠিক রাখতে পারবো এমন মনে করা কে - কি বলা যায়!

আমি বললাম দাজ্জাল এর ফিতান। এটা কেমন ফিতান? রাসুল সাঃ বলেছেন কিয়ামতের আগ পর্যন্ত এর চেয়ে বড় কোন ফিতান আর নাই। দাজ্জাল হচ্ছে কিয়ামতের আগে সবচেয়ে বড় ফিতান!!! দাজ্জালের ফিতান এতই ভয়াবহ যে রাসুল সাঃ বলেছেন প্রত্যেক নবী তাঁর উম্মত কে দাজ্জালের ফিতান সম্পর্কে

সাবধান করেছেন কিন্তু আমি তোমাদের কে তার বর্ণনাও দিয়ে দিচ্ছি দাজ্জাল হচ্ছে আওয়ার - এক চোখ কানা কিন্তু তোমাদের রব্ব আওয়ার নন। এরকম আরো অনেক অনেক হাদিস। কেন দাজ্জালের ফিতান এত ভয়াবহ? অনেক অনেক কারণ আর সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে - দাজ্জাল নিজেকে খোদা প্রমান করবে আল্লাহও দাজ্জাল কে তেমন ক্ষমতা দিবেন। চিন্তা করে দেখি - দাজ্জাল ছাড়াই আমরা সামান্য কিছু দুনিয়াবি স্বার্থের জন্য আল্লাহর হুকুম কে সাইডে সরিয়ে রাখি, আর যখন দাজ্জাল নিজে প্রকাশ পাবে তখন কি হবে!

বিষয় টা শুধু দাজ্জাল নিয়ে নয়, **দাজ্জাল এর কথা টা শুধু মাত্র একটা উদাহরন হিসেবে**। মূল বিষয় টা হচ্ছে - দ্বীন এবং দ্বীনের জ্ঞান থেকে আমরা অনেক অনেক দূরে অবস্থান করি। আমার এখনো মনে আছে - কোন এক বই মেলায় আসাদুজ্জামান নূর ঘোষণা দিয়েছিলো - **এবারের বই মেলায় দাজ্জালের বই সিডি এগুলো বিক্রি করতে দেয়া হবেনা,** কথাটা শুনে একটা হাদিসের কথা মনে পড়ে যায় (ভাবার্থে) - যখন দেখবে মানুষ দাজ্জালের ব্যাপারে কথা বলা ছেড়ে দিয়েছে বা এমন বলে যে দাজ্জাল এখনো অনেক দেরি তখন বুঝবে হয় দাজ্জাল চলে এসেছে অথবা সময় খুবই নিকটে।

দাজ্জাল আসার একটা চিহ্ন হচ্ছে মানুষ দাজ্জাল কে নিয়ে কথা বলা বন্ধ করে দিবে।

যে কথা বলছিলাম - **দ্বীন এবং দ্বীনের জ্ঞান থেকে আমরা অনেক অনেক দূরে অবস্থান করি।**

আল্লাহ বলেছেন আমি আজ তোমাদের জন্য দ্বীন কে পরিপূর্ণ করে দিলাম - কম বেশি প্রত্যেক মুসলিম এই আয়াত টা জানে। কিন্তু এই আয়াতের বাস্তবায়ন টা কেমন হতে পারে? কুরআন শুধু কোন কিতাব না, এই আয়াতের বাস্তবায়নের স্বরূপ কেমন হতে পারে তার একটা উদাহরন হচ্ছে কুরআনেরই আরেকটা আয়াত আর সেটা হচ্ছে - আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত ধর্ম/দ্বীন হচ্ছে ইসলাম। এটার ই বা বাস্তবায়ন কেমন? এই আয়াতের বাস্তবায়নের স্বরূপ কেমন হতে পারে তার একটা উদাহরন হচ্ছে কুরআনেরই আরেকটা আয়াত আর সেটা হচ্ছে, "তাহলে কি তোমরা আল্লাহর কিতাবের এক অংশ গ্রহন কর আর আরেক অংশ ছেড়ে দাও - "আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

এখন আমাদের সন্তানেরা অনেক ব্যাস্ত দুনিয়ার ইলম শেখার জন্য কিন্তু আমাদের সন্তানেরা কি এই আসন্ন ফিতান সম্পর্কে জানে? দুনিয়ার ডিগ্রি, দুনিয়ার সফলতার জন্য আমরা আমাদের সন্তানদের কত কিছুই না শেখাই,কিন্তু দ্বীন এর ব্যাপারে, অনন্ত জীবনের সফলতার ব্যাপারে আমরা তাদের কতটুকু শেখাই? আমরা নিজেরা কত টুকু শিখি?

বানী ঈসরাইলের একটি ঘটনা হয়ত আমরা জানি যে - তাদের শিরক এর অপরাধে আল্লাহ তাদের প্রায়শ্চিত্ত করতে বলেছিলেন নিজেদের কে হত্যা করে। কেন? কারণ শিরক আসলে এত বড় পাপ যে এই পাপের সামনে নিজেকে হাজার বার হত্যা করে ফেলাও অনেক কম। **এখন আমরা আমাদের সন্তানদের বড় করি শিরক এর আবহে আমাদের কোন খোঁজ ই নাই যে এটা শিরক!!** দাজ্জাল তো না হয় আপাতত বাদ ই দিলাম!

আমি জানি কথা গুলো বিক্ষিপ্ত হচ্ছে - এটা আমার অক্ষমতা এবং বিষয়টাও আসলে এমনই। এক শায়েখ কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো শায়েখ ইসলামে সব কিছু শুধু হারাম কেন? শায়েখ বলেছিলেন **কারণ সমস্ত হারাম গুলো কে টুকিয়ে নিয়ে এসে তুমি সেগুলোর ব্যাপারে আমার থেকে হালাল ফাতওয়া আশা করছো, তাই।** আমরা আজ দ্বীন থেকে এত দূরে চলে গেছি যে তা এখন অনুধাবন করাও কঠিন! এবার এটাও ঠিক যে আমরা এই দ্বীন কে অস্বীকার ও করতে চাইনা। এই দুই এর সমন্বয় করতে গিয়ে আমরা যা করেছি তা হচ্ছে - দ্বীনের ব্যাপারে আমাদের ভিতরে যে শুন্যতা ছিলো সেগুলোর মধ্যে এখন চলে আসছে নানা রকম ভ্রান্ত ধারনা এমন কি শিরক পর্যন্ত যাকে আমরা আসলে দ্বীন ই ভাবছি!

যেমন মক্কায় প্রথম যে মূর্তি উপাসনা শুরু হয়েছিলো তা কিন্তু শিরক কে প্রতিপাদ্য করে নয়, বরং তারা তো ভেবেছিলো এটা আসলে একটা খুব ভালো কাজ! আর এটা হয়েছিলো দ্বীন এর ব্যাপারে তাদের উদাসিনতা এবং অজ্ঞতার কারণে।

সব শেষে আমি কি বলতে চাচ্ছি?

আমি বলতে চাচ্ছি আমাদের হাতে সময় খুব কম - একবারেই নাই এমন ধরা যায়। কিন্তু কিভাবে আমার কথার সত্যতা প্রমান করবো! এটা তো প্রায় অসাধ্য কাজ বলা যায়। ঐ যে আমরা সরে গেছি অনেক অনেক দূর। তারপরেও আমাদের কাজ একে অপরকে সাবধান করা। আমাদের জন্য সময় অনেক কম। রাসুল সাঃ হাদিস

গুলো সব সামনে চলে আসছে, দেখেন না হয় ফিতান এর কিতাব খুলে। এর জন্য অনেক বড় আলিম হতে হবে না। **"ফিতান হাদিস বাংলা" লিখে সার্চ দিয়ে দেখেন। না হয় শুধু বুখারী মুসলিম এর হাদিস গুলোই দেখেন যার ব্যাপারে আপনার বিশ্বাস আছে।**

আমরা একটা মারাত্মক সময় পার করছি - ওয়াল্লাহি যদি আমরা বুঝতাম !!! এখন এই শেষ সময়ে আমাদের আপ্রান চেস্টা করা নিজেদের দ্বীন কে বুঝা এবং জানা। আল্লাহ সুবহানাহু ওতায়ালা তাঁর রাসুল সাঃ এর উপরে যে দ্বীন নাজিল করেছেন, রাসুল সাঃ যে দ্বীন প্রচার করেছেন আমি সেই দ্বীনের কথা বলছি। **কোন ফুলান কিংবা মুফতি ব্র্যাডলি এর কথা বলছিনা। একটু সময় নিয়ে চিন্তা করেন - আমি বা আপনি ইসলাম সম্পর্কে যেভাবে জানি - এটা আমরা কার থেকে শিখেছি। কে আমাদের কেই এই ইসলাম শিখিয়েছে? আমি যে ভাবছি, আমি তো ইসলামের উপরেই আছি এই ইসলাম টা আমি কোথা থেকে শিখেছি? এই ব্যাপারে আসলেই আল্লাহ কি বলেছেন? কুরআনে কি বলা আছে? রাসুল সাঃ কি বলেছেন? আমার ঈমান কি ঠিক আছে? নাকি তা নস্ট হয়ে গেছে?** সাহাবারা মদিনার রাস্তায় চিৎকার করে উঠতেন - আমি মুনাফিক হয়ে গেছি ! ওয়াল্লাহি।

কিন্তু আমরা আজ পরিপূর্ণ ঈমানের বিলাসিতা নিজের উপরে চাপিয়ে নিয়েছি। কিন্তু যদি ভুল হয়? আমি আমার সন্তান কে যেভাবে বড় করেছি যদি তা ভুল হয়! **একটা জমি কেনার আগে ফ্ল্যাট কেনার আগে আমরা কত হিসাব মিলাই আখেরাত এর জিন্দেগির হিসাব টা ঠিক থাকলো কিনা এই হিসাব লাস্ট কবে মিলিয়েছি!!**

সে মৃত্যু একবারই এর পরে আর কোন মৃত্যু নাই। সেই দিনের জন্য আমি আপনি আমার পরিবার কতটকু প্রস্তুত?

আল্লাহ আপনি আমাদের উপরে রহম করুন - আমীন

পোস্ট লিংক : https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১৭৪২

কিছু কথা আমার জন্য এবং আমার প্রিয় ভাইদের জন্য

s_forayeji

Moderator

০৬-০২-২০১৮

বিসমিল্লাহ ওয়াস সালাতু আস সালাম আলা রাসুলিল্লাহ

আমার জন্য এবং আমাদের জন্য নিজের কিছু কথা - আমি আশা রাখি আল্লাহ এর মধ্য থেকে আমাকে কল্যান কিছু দান করবেন।

দ্বীন বুঝার প্রথম দিকে কিছু আয়াত আমাকে খুব হিট করে - সুরা আস সফ এর ১০ থেকে ১৩ এই আয়াত ৩ টা আমার কাছে এত ভালো লাগে যে, বলার মত না। খুব ছোট ছোট আয়াত অথচ অনেক অনেক ভারী - আসলে আমরা আল্লাহর কথার দিকে মনোযোগ দেইনা যে কথা টা কি এবং আরো যেটা মনোযোগ দেইনা সেটা হচ্ছে কথা টা কার!

আল্লাহ মুমিনদের জন্য জিব্রিল আলাইহিস সালাম কে দিয়ে একটা ব্যাবসার অফার পাঠালেন - শুধু মুমিনদের জন্য - ইয়া আইয়ু হাল্লাজিনা আমানু হাল আদুল্লুকুম আল তিজারাত - মানে এই অফার অন্য কারও জন্য না। শুধুই মুমিনদের জন্য। আর এই অফার আল্লাহ শেষও করেছেন মুমিনদের উল্লেখ করে - ওয়াবাশশিরিল মুউ'মিনিন। আলহামদুলিল্লাহ আশা রাখি যে আমরা আল্লাহর সেই ব্যাবসার উপরে আছি ইনশাআল্লাহ - আমরা অন্য কারো ব্যাবসা করিনা, সরাসরি আল্লাহর ব্যাবসা করি। বাস্তব! ওয়াল্লাহি আল্লাহ তাই বলেছেন - "তিজারাত" এই এই আয়াত জিবরিল আমীন আলাহিস সালাম ই নিয়ে এসেছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে মুমিনের জন্য!

কোন এক দিন কুরআন পড়ছিলাম - হঠাত একটা আয়াত চোখে পড়ল - সুরা আলইমরান ১৭৫ –

إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

এই যে এই শয়তান তোমাদের কে তার আউলিয়াদের ব্যাপারে ভয় দেখায় - তাদের কে ভয় পাবার কোন দরকার নাই - বরং আমাকেই ভয় কর যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো! আজিব এক আয়াত!!!

আল্লাহ বলতেছেন - এই র‍্যাব, ডিবি, হেনো তেনো এদের ব্যাপারে শয়তান তোমাদের ভয় দেখায় - তাদের ভয় পাবার দরকার নাই, বরং আমাকেই ভয় কর। অদ্ভুত - আল্লাহ সোজা সাপ্টা বলে দিচ্ছেন - তারা হচ্ছে শয়তানের চ্যালা চামুন্ডা তাদের কে ভয় পাবার কোন দরকার নাই। ভাই এখানেও সেই একই সমস্যা। আল্লাহ বলে দিলেন ভয় পাবার দরকার নাই, কিন্তু আমরা আবার ও মিস করি কথাটা কার। আল্লাহ বলে দিয়েছেন ভয় পাবার দরকার নাই - ব্যাস কথা এখানেই শেষ। **আমাদের কে আল্লাহর কালামের উপর ইয়াকিন রাখতে হবে। আর ইয়াকিন হচ্ছে বিশ্বাসের সেই ধরন যা বিশ্বাস কে কাজে পরিনত করে।** যেমন স্মরন করেন - রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালাম বলছিলেন বদর এর আগে, আল্লাহ আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ২ টি দলের যে কোন একটির উপরে আমাদের বিজয় দিবেন, আমি যেন মক্কার কাফের পরাজয় দেখতে পাচ্ছি (আও কামা কলা আলাইহিস সালাম)। এটা হল ইয়াকিন।

সুবহান আল্লাহ - আল্লাহ জানেন এমনও হাল হয়ত আসবে তাঁর দুর্বল বান্দারা খুব ভয় পাবে, আল্লাহ জিব্রিল আলাইহিস সালাম কে পাঠায়ে দিলেন যাও বলে দাও - তাদের ভয় পাবার কোন দরকার নাই।

ট্রিক অফ হুদ আলাইহিস সালাম - হুদ আলাইহিস সালাম এর কওম যখন হুদ আলাইহিস সালাম কে থ্রেট দেয়া শুরু করলো, হুদ আলাইহিস সালাম বললেন, ওকে আমাকে কোন সুযোগ দিওনা, দিনে কিংবা রাতে তোমরা আমাকে আক্রমন কর। বছরের পর বছর ধরে তারা হুদ আলাইহিস সালাম এর সাথে ফাইট করতে থাকলো কিন্তু ক্ষতি করা তো অনেক দুরের কথা, তারা হুদ আলাইহিস সালাম কে ছুঁয়েও ও দেখতে পারলোনা!! **আর শেষে হুদ আলাইহিস সালাম কাফিরদের কে তাঁর ফর্মুলা টা বলে দিলেন - ইন্নি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহি রব্বি ওয়া রব্বুকুম। আমি তো ভরসা করেছি আমার এবং তোমাদের রব্ব এর উপরে !!! (তোমাদের মত নিজের বাহুর আর পেশির শক্তির উপরে না)**

প্রিয় ভাই আমার - **তারা তো ইব্রাহীম আঃ কে আগুনে ফেলে দিলো আর সবার চিন্তা ছিলো কিভাবে আগুন কে নিভানো যায়! আর আল্লাহ বলে দিলেন আগুন তুমি ইব্রাহীম এর জন্য আরামদায়ক হয়ে যাও, সাগর ডুবাতে পারেনি মুসা আলাইহিস সালাম কে, তিমি হজম করতে পারেনি ইউনুস আলাইহিস সালাম কে –**

আল্লাহ বলছেন, ফা'লামু - আন্নাল্লাহা মাওলাকুম নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মান নাসির - জেনে রাখো আল্লাহ তোমার জন্য অভিভাবক/রক্ষাকারী, আর সাহায্যকারী/রক্ষাকারী হিসেবে আল্লাহ কতই না উত্তম!!

একটা হাদিস শুনেছিলাম - জিবরিল আলাইহিস সালাম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতেসেন ইয়া রাসুলাল্লাহ আপনার উম্মতের সব আমল পরিমাপ করা হয়/লিপি বদ্ধ করা হয় কিন্তু তাদের চোখের পানি লিপিবদ্ধ করা হয়না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে চাইলেন কেন? জিবরিল আলাইহিস সালাম উত্তর দিলেন ইয়া রাসুলুল্লাহ আপনার উম্মতের এক ফোটা চোখের পানি জাহান্নামের আগুনের সমুদ্র কে নিভিয়ে দেয় - তা কিভাবে লিপিবদ্ধ অরা সম্ভব! (আও কামা কলা আলাইহিস সালাম)

এই দ্বীনের পথ কিছু টা তো কঠিনই, তবে এমন আহামরি কঠিন কিছু না। আল্লাহ আপনার বেপারে বেখায়াল নন আমার ভাই। ওয়াল্লাহি আল্লাহ আপনাকে যত মুহাব্বাত করেন আপনি নিজে নিজেকে তত মুহাব্বাত করেন না। আল্লাহ আপনার জন্য জান্নাত তৈরি করে রেখেছেন, আপনাকে যদি বলা হত নিজের জন্য কিছু বানাও আর সমস্ত উপকরন দিয়ে দেয়া হত, নিজের জন্য আমি আপনি আলসেমি করে এক সময়ে হয়ত বসে যেতাম, কারণ এটাই আমাদের ফিতরাত কিন্তু আল্লাহ আমাদের জন্য জান্নাত তৈরি করে রেখেছেন আমাদের জন্য ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ বলেন - লা ইউকাল্লিফুল্লাহু নাফসান ইল্লা উসআআহা - আল্লাহ তার উপরে ততটুকুই দেন যে যতটুকু সহ্য করতে পারবে। বালা মুসিবত যা আসে তা আল্লাহর ইচ্ছাতেই আসে, কল্যানের জন্যই আসে। হয়ত ঈমান এ মজবুত করে অথবা সম্মান কে বৃদ্ধি করে।

আল্লাহ তার পসন্দের কোন বান্দার জন্য জান্নাতে অনেক মর্যাদার একটি স্তর নির্ধারন করে রাখেন, এতই মর্যাদাবান যে বান্দা নেক আমল দিয়ে কখনই সেখানে যেতে পারবেনা। কিন্তু আল্লাহর এটা পসন্দ যে এই বান্দা সেখানে যাক, আল্লাহ তখন বান্দা কে কিছু পরিক্ষার মধ্যে ফেলে দেন, আর বান্দা যখন এই হালাত এ সবর করে আল্লাহ নিজ দয়ায় তার মর্যাদা বৃদ্ধি করতে থাকেন।

হাদিসে কুদিসেত পড়েছিলাম - **আল্লাহ বলেন বান্দা যখন ঠোঁট নাড়ে এবং আমেক স্মরন করে আমি তার সাথেই (আমি আছিই তোমার সাথে)**

প্রিয় ভাই আমার -এই দুনিয়া আমাদের জন্য না। এই দুনিয়া এই তাগুত আর মুরতাদ দের জন্য! পরকালে তাদের কিছুই নাই। **হায় আফসোস, তারা তো এক গ্লাস পানিও পাবেনা। তারা তো খাবে গলিত পুঁজ আর দুর্গন্ধ ময় কাঁটাযুক্ত জাক্কুম।** (আল্লাহর পানাহ) আমাদেরই কতক এখন জান্নাতে তাদের নিজ ঠিকানা দেখে নিয়েছেন ইনশাআল্লাহ - আর আল্লাহর আরশের নিচে ঝুলে থাকেন সবুজ পাখি হয়ে!!! আহ! কতই না সফল সেই জিন্দেগী!

সাহাবাদের এমন এক দল বলছিলেন আমাদের এই হাল কেউ যদি আমাদের ভাইদের জানিয়ে দিত! আল্লাহ বলছেন আমি জানিয়ে দিব - আল্লাহ বলছেন তোমরা তাদের কে মৃত বলোনা তারা জিবিত! আল্লাহর পক্ষ থেকে রিজিক প্রাপ্ত !!!

প্রিয় ভাই আমার - তারা তো আমাদের হত্যা করে জান্নাতে পাঠিয়ে দিবে ইনশাআল্লাহ আর প্রতি টা জুলুমের সাথে আমকে আল্লাহর আরশের নিকটবর্তি করবে ইনশাআল্লাহ।

আজ আর কথা বাড়াবোনা ভাই –

আল্লাহ বলছেন আমি বান্দার আমল নষ্ট করিনা, আল্লাহ আরো বলছেন, সাওয়াবাম মিন ইনদিল্লাহ ওয়াল্লাহু ইনদাহু হুসনুস সাওয়াব! **প্রিয় ভাই আমার আমরা তো আশা রাখি এক দিন আল্লাহ আমাদের দিকে তাকায়ে হাসবেন, একদিন আমাদের জন্য জান্নাতের দরজা গুলো খুলে দেয়া হবে আর ফেরেশতারা বলবে সালামুন আলাইকা, এক দিন আমাদের জান্নাতী স্ত্রী গন দৌড়ে আমাদের দিকে আসবে, একদিন রাসুলে আকরাম সাঃ আমাদের সাথে কথা বলবেন। রাসুল কে বলব আস সালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ আপনি আমাদের জন্য কত দুয়া করেছেন আজ আমাদের দেখ হয়ে গেল! ও ভাই আমাদের জন্য তো আছে আমাদের রব্ব এর খুশি - আজকের পর থেকে আমি আর কোনদিন ও তোমাদের উপরে নারাজ হবোনা !!!**

প্রিয় ভাই –আল্লাহ আমাদের ভুল গুলো ক্ষমা করুন, এই দুয়া করি। আল্লাহ আমাদের সকল বন্দী ভাইদের উপরে রহম করুন, তাদের পরিবারকে সম্মানিত করুন এবং নিরাপত্তা নসিব করুন। আল্লাহ তাঁর রাসুল সাঃ কে বলেছিলেন –

আপনি আমাদের চোখের সামনেই আছেন। আল্লাহ বলছেন আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির কোন কিছুর বেপারেই গাফেল নন, ওয়ামা কুন্না আনিল খালকি গফিলুন।

ভাই সবশেষে আমি খাস ভাবে আপনার কাছে দুয়ার দরখাস্ত করেতসি আমার জন্য আল্লাহর কাছে দুয়া করবেন, আল্লাহ যেন আমাকে মাফ করে দেন, আল্লাহ যেন আমাকে কবুল করে নেন এবং আল্লাহ যেন আমাকে শাহাদাত নসিব করেন। আল্লাহ যেন আমাদের কে তাঁর সন্তুষ্টির জান্নাতে একত্রিত করেন আমীন।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৯৯২৫

জিহাদে অংশগ্রহণের ৪৪টি উপায়।

tarek bin ziad

Senior Member

০৭-১৯-২০১৮

জিহাদে অংশগ্রহণের ৪৪টি উপায়।

-------- ইমাম আনোয়ার আল-আওলাকি (রহিঃ)

০১ = জিহাদের জন্য বিশুদ্ধ নিয়ত থাকা।
০২ = শাহাদাত পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা।
০৩ = নিজের মাল দারা জিহাদ করা।
০৪ = মুজাহিদদের জন্য টাকা সংগ্রহ করা।
০৫ = একজন মুজাহিদকে টাকা দিয়ে সাহায্য করা।
০৬ = একজন মুজাহিদের পরিবারকে দেখাশোনা করা।
০৭ = শহীদের পরিবারকে দেখাশোনা করা।
০৮ = জেলে বন্দি ভাইদের পরিবারগুলোর দেখাশোনা করা।
০৯ = মুজাহিদদের যাকাত প্রদান করা (জিহাদের খরচ বাবদ)।
১০ = মুজাহিদদের মনোবল বাড়ানো এবং তাদের উৎসাহ প্রদান করা।
১১ = মুজাহিদদের চিকিৎসায় সাহায্য প্রদান করা।
১২ = মুজাহিদদের সমর্থন করা এবং তাদের জন্য উঠে দাঁড়ানো।
১৩ = পশ্চিমা মিডিয়ার মিথ্যাচারের মোকাবিলা করা।
১৪ = মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন করা।
১৫ = জিহাদের ব্যাপারে অন্যদের উৎসাহ প্রদান করা।
১৬ = মুজাহিদদের নিরাপত্তা দেয়া এবং তাদের গোপোনীয়তা রক্ষা করা।
১৭ = মুজাহিদদের জন্য দোয়া করা।
১৮ = জিহাদের খবর জানা এবং তা প্রচার করা।
১৯ = মুজাহিদ এবং তাদের আলেমদের লেখনী প্রচার করা।
২০ = মুজাহিদদের পক্ষে ফতোয়া দেয়া।
২১ = আলেম এবং ইমামদের মুজাহিদদের তথ্য এবং খবর পৌঁছে দেয়া।
২২ = শারীরিক যোগ্যতা অর্জন করা।

২৩ = অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ নেয়া।

২৪ = প্রাথমিক চিকিৎসার প্রশিক্ষণ নেয়া।

২৫ = জিহাদের ফিকহ্ ও মাসলা জানা।

২৬ = মুজাহিদদের রক্ষা করা এবং তাদেরক সাহায্য করা।

২৭ = "আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্য ঘৃণা" – এই আকিদার বিকাশ করা।

২৮ = মুসলিম বন্দীদের প্রতি আমাদের দায়িত্য পালন করা।

২৯ = জিহাদি ওয়েবসাইট তৈরী করা।

৩০ = আমাদের সন্তানদের জিহাদ এবং মুজাহিদদের প্রতি ভালবাসা শেখানো। ফতোয়া দেয়া।

৩১ = বিলাসী জীবনযাপন এড়িয়ে চলা।

৩২ = মুজাহিদদের কাজে লাগে এমন যোগ্যতা অর্জন করা।

৩৩ = যে সব দল জিহাদের জন্য কাজ করছে তাদের সাথে যোগ দেয়া।

৩৪ = হক আলেমদের দিকে অন্যদের এগিয়ে আনা।

৩৫ = হিজরতের জন্য প্রস্তুত থাকা।

৩৬ = আত্মিক প্রশিক্ষণ নেয়া।

৩৭ = মুজাহিদদের নসিহাহ্ দেয়া।

৩৮ = ফিতনা বিসয়ের হাদিস পড়া।

৩৯ = বর্তমান যুগের ফেরাঊন এবং তার জাদুকরদের মুখোশ উন্মোচন করা।

৪০ = নাসেদ (জিহাদী গজল) তৈরী করা।

৪১ = শত্রুদের অর্থনীতি বর্জন করা।

৪২ = আরবী শেখা।

৪৩ = বিভিন্ন ভাষায় জিহাদি লেখনী অনুবাদ করা।

৪৪ => "মুক্তি প্রাপ্ত দল" – এর বিশিষ্ট সম্পর্কে অন্যদের শিক্ষা দেয়া।

পোস্ট লিংক : https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১০২১২

প্রিয় ভাইদের প্রতি পড়ে দেখার অনুরোধ

s_forayeji

Moderator

১২-১৯-২০১৮

বিসমিল্লাহ ওয়াস সালাতু আস সালাম আলা রাসুলিল্লাহ

প্রিয় ভাইয়েরা আমার, আপনারা জানেন যে আমরা একটা যুদ্ধের ময়দানে আছি। আপনি ঘরে থাকেন বা বাইরে থাকেন যেখানেই থাকেন না কেন আমি এবং আপনি আমরা সবাই যারা অন্তত ঈমানের শেষ আলো টুকু নিভিয়ে দেয়নি বা নিভে যেতে দেয়নি তারাই আল্লাহর দুশমনদের সাথে যুদ্ধে আছি।

আপনি বিশ্বাস করেন, আপনি নিরাপদ না ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না আমি বা আপনি তাদের মত হয়ে যাবো। এটা আল্লাহর কথা, আল্লাহ বলেছেন, তারা চায় তোমরাও তাদের মত কাফের হয়ে যাও। এটাই বাস্তবতা। আপনাদের স্মরন আছে কিনা জানিনা অনেক দিন আগে একবার নিউজে এসেছিলো দেশের উঠতি বয়সী ছেলে মেয়ে রা জঙ্গিবাদ, উগ্রবাদের দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে। কিসের ভিত্তিতে তাদের এই কথা? তাদের ভিত্তি হচ্ছে, এখন ছেলে মেয়েদের কথায় আরবি শব্দ অর্থাৎ সালাম, আলহামদুলিল্লাহ, ইনশাআল্লাহ, এগুলো বেড়ে গেছে। মেয়েরা এখন হিজাব, নিকাব করছে, ছেলেদের প্যান্ট গোড়ালির উপরে হয়ে গেছে এবং - এগুলোই হচ্ছে তাদের মতে উগ্রবাদের নিদর্শন। একই সাথে এই যুবক শ্রেণী মঙ্গল শোভা যাত্রা কিংবা পহেলা বৈশাখের মত শিরক, বিদয়াত কে প্রত্যাখ্যান করছে এটাও উগ্রবাদএর আগ পর্যন্ত কোন - অর্থাৎ আপনাকে তাদের মত হতেই হবে ! নিস্তার নাই।

আপনি জাতির পিতা হিসেবে ইবরাহিম আঃ মানেন কিংবা না মানেন কোন সমস্যা নাই, কিন্তু আপনি জাতির পিতা হিসেবে শেখ মুজিব মানেন না, এতে সমস্যা আছে। শুধু সমস্যা না অনেক বড় সমস্যা আছে!

আমি শুরুতে বলেছিলাম যে তারা আপনাকে, আমাকে, আমার ঈমান নিয়ে থাকতে দিবেনা, দিবেনা দিবেনা। এখানে আর কথা পেচায়ে কোন লাভ নাই, যত বড় মুফতি ফুলান কিংবা শায়েখ ব্র্যাডলি অন্য রকম বলুক না কেন। আসলে

বাস্তবতা এত করুন যে এখন এই সব কথা বলাটাও এক রকম বিলাসিতাসারা ! দুনিয়াতে যখন উম্মাতে মুহাম্মাদী সাঃ শুধু মাত্র তার নিজের ঈমানের জন্য রক্তাক্ত হচ্ছে তখন যদি এই কথাকে প্রমান করার চেষ্টা করতে হয় তাহলে তা বিলাসিতাই বটে।

আজ আপনাদের সাথে কথা বলার মাকসাদ ভিন্ন। আগেই বলেছি যে আমরা যুদ্ধের ময়দানেই আছি। এটা আমরা যত দ্রুত উপলব্ধি করতে পারবো ততই মঙ্গল।

আমরা বসে থাকি, কিন্তু আমাদের শত্রু রা বসে থাকেনা। তাদের কোন ক্লান্তি নাই। তাদের চোখের পাতা বন্ধ হয়না। ইউটিবের একটা বিখ্যাত দাওয়াহ চ্যানেল Merciful Servant - আপনারা অনেকেই নাম শুনেছেন, ভিডিও দেখেছেন। কিছু দিন আগে ইউটিউব কোন কারণ ছাড়াই তাদের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেয়, এমনকি পেপ্যাল তাদের সমস্ত লেনদেন আটকায়ে দেয়। এর কারণ হিসেবে তারা একটি কথাই বলে - এটা উপরের নির্দেশ এর বেশি আর কিছু আমরা বলতে পারবোনা।

তো এই যে যুদ্ধের কথা বললাম এই যুদ্ধের অনেক বড় একটা ময়দান হচ্ছে - মিডিয়া। সত্য কথা হচ্ছে এটা বুঝানো প্রায় অসাধ্য যে এটা আসলে কত বড় ময়দান। জিহাদ, মিডিয়ার অর্ধেক কিংবা তারও বেশি। বর্তমানে মিডিয়া ব্যাতিত কোন যুদ্ধ সফল হতে পারবেনা, আপনি লিখে নিতে পারেন। যত সামরিক শক্তিই থাকুক না কেন মিডিয়া যদি পক্ষে না থাকে কোন শক্তির পক্ষে যুদ্ধে জেতা প্রায় অসম্ভব। ফিল্ডে যদি জিতেও যায় মোরালের দিক থেকে তারা পরাজিত হবেই, হতেই হবে। এই কথার জন্য অ্যামেরিকার চেয়ে বড় আর বাস্তব উদাহরন কে হতে পারে!

কথা হচ্ছিলো মিডিয়া নিয়ে। এই মিডিয়া এবং যুদ্ধের সাথে মিডিয়ার সম্পর্ক নিয়ে আমি সামান্য কথা বলব এর পরেই মূল কথায় চলে যাবো ইনশা আল্লাহ।

মিডিয়া এবং যুদ্ধ একটি আরেকটির সাথে মুদ্রার মত, অন্তত মডার্ন ওয়ারফেয়ারে। মিডিয়া যুদ্ধ ছাড়া টিকে থাকবে, তবে মিডিয়া ব্যাতিত যুদ্ধ টিকতে পারবেনা। যুদ্ধের অন্যান্য সব এলিমেন্টস এবং লজিস্টিকস এর মত মিডিয়াও এখন যুদ্ধের উপাদান। এবং কখনো তা ডিসাইসিভ এলিমেন্ট অফ দা ওয়ার।

মিডিয়া নিজে একটি স্বতন্ত্র ওয়ার মেশিন এবং কনভেনশনাল ওয়ার থেকে এই ওয়ার মেশিনের সুপিরিওরিটি অনেক দিক থেকে বেশি। আমাদের মিডিয়ার স্বরূপ খুব পরিষ্কার ভাবে জানা দরকার, কারণ মিডিয়া এখন শুধু বিনোদনের জন্য নয়। একটা কনভেনশনাল ওয়ার এর জন্য দরকার বিলিওন বিলিওন ডলার, ম্যানপাওয়ার, মেশিনারিজ, হিউজ লাইন অফ কমিউনিকেশন্স, লজিসটিক্স, অনেক কিছু। শুধু তাই নয় একটি যুদ্ধ কে প্রস্তুত করার জন্য এর আগে পিছে অনেক স্টোরি তৈরি করতে হয়। কনভেনশনাল ওয়ারে – ফিজিক্যাল গ্রাউন্ড দরকার হয় এবং সেটার লিমিটেশন আছে। শুধু তাই নয় – সব সময়ে এখানে রিস্ক থাকে ফিজিক্যাল এবং ইডিওলজিক্যাল। অপর দিকে মিডিয়া কে যদি আমরা এরকম একটা ওয়ার মেশিন হিসেবে চিন্তা করি তাহলে মিডিয়ার নিজস্ব ওয়ার মেকানিজম আছে। একটি কমন মেকানিজম হচ্ছে প্রোপাগান্ডা বা সাইকোলোজিক্যাল ওয়ার। মজার ব্যাপার হচ্ছে – এটি এমন এক যুদ্ধ, যে যুদ্ধতে কোন যুদ্ধ না করেই জেতা যায়এর জন্য কোন বিলিওন ডলার ইনভেস্টমেন্ট লাগেনা !, লাগেনা হাজার হাজার ট্রুপ্স। শুধু তাই নয় এই যুদ্ধ সারা দুনিয়াব্যাপী এক সাথে চালানো যায়। দরকার শুধু এমন কিছু মানুষ যারা এই কাজে এক্সপার্ট। এবং হয়ত তুলনামূলক ভাবে খুবই কম ফাইন্যান্স। একই সাথে এই যুদ্ধে আপাত কোন রিস্ক ও নাই।

মডার্ন ওয়ারফেয়ারে মিডিয়া একটি আর্মড উইং। যদিও অন্যান্য আর্মড উইং এর মত এর কোন ফিজিক্যাল আর্সেনাল নাই, অন্তত যা চোখে দেখা যায়। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এটিই মিডিয়ার অন্যতম আর্সেনাল যে সে আপনাকে এবং আমাকে সব সময়েই এই ধোঁকা দিতে পারে যে সে তো শুধুই মিডিয়াআপনি বা আমি ! থেকে বোম্ব আশা ১৬এফ করি কিন্তু মিডিয়াও যে এফ১৬ এর চেয়ে কম ভয়ংকর কিছু না তা আমরা বুঝতেই পারিনা! আর এই লাইন গুলো বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে মিডিয়াও আঘাত করতে সক্ষম এবং তাও মারাত্মক ভাবে এটি পরিষ্কার করা।

এতকথা বলার উদ্দেশ্য ছিলো ওয়ার মেশিন হিসেবে মিডিয়ার সুপিরিওরিটি কতটুকু তার একটা হালকা আভাস তুলে ধরা।

মূল কথাঃ

এই মিডিয়া যুদ্ধের জন্য আমাদের প্রস্তুতি কি? অনেক ভাই আছেন জিহাদের জন্য উদগ্রীব আলহামদুলিল্লাহ। আমি আপনাদের বিনীত ভাবে বলব, আপনি জিহাদ

করতে চান? মিডিয়াও জিহাদের অংশ, শুধু তাই নয় মিডিয়া জিহাদের অর্ধেক কিংবা এর ও বেশি। এটি আমার কথা নয়, এটি বড় বড় মুজাহিদিন কমান্ডারদের কথা যারা তাদের জিন্দেগী পার করেছেন জিহাদের ময়দানেবেন আপনি অবাক হ ! এমন নির্দেশনা পর্যন্ত আছে কোন ভাই যদি মিডিয়ার কাজে পারদর্শী হোন তবে তাকে ময়দানের এমন কাজে যেতে দেয়া যাবেনা যে কাজ অন্য যে কোন মুজাহদিন ভাই পারেন। আমি বার বার তাই বলছি - যা শায়েখরা বলেছেন - যিনি মিডিয়ার জন্য নিজেকে ব্যাস্ত রাখলেন আর যিনি রিবাতের জন্য দাঁড়িয়ে থাকলেন এই দুইয়ের আমলের পুরস্কারে কোন তারতম্য হবেনা, এটি আমার কথা নয় বরং এটি মুজাহিদিন শায়েখদের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত ফাতওয়া।

তারা মুভি বানায় "হাসিনা এ ডটার্স টেল", বাংলালিঙ্ক নেক্সট টিউবারস আয়োজন করে তরুনদের মধ্য থেকে ঘৃণ্য জাতীয়তা বোধ কিংবা খুব সস্তা কোন দুনিয়াবি চেতনা নিয়ে ভিডিও বানানোর জন্য তরুনদের খুজে খুজে বের করে, কিন্তু হায় আফসোস আমার রাসুল সাঃ এর সিরাত নিয়ে কিংবা আল্লাহর দ্বীন কিংবা মিল্লাতে ইবরাহিমের চেতনা নিয়ে ভিডিও বানানোর জন্য আমরা কাউকে খুজে পাইনা! নোংরা অশ্লীল গানের প্রচার আর প্রসারে বাজার সয়লাব হয়ে যায় কিন্তু বিশুদ্ধ আকিদাহ আর মানহাজের কথা প্রচার করার জন্য কাউকে খুজে পাওয়া যায়না। সালমান মুক্তাদিরের মত বেজন্মারা যুবকদের রোল মডেল হয়ে যায় অথচ দ্বীনের ব্যাপারে কথা বলার জন্য এক জন মুসয়াব ইবনে উমাইর খুজে পাওয়া যায়না!

এমন কেউ নাই তা আমি বিশ্বাস করিনাকরা উচিত না। আমি বিশ্বাস করি তারা ! - আছে কিন্তু আমাদের দরকার তারা এই ময়দানের ফ্রন্ট লাইনে আসুক। সত্যিই কি এমন যুবক নাই যে রাসুল সাঃ সিরাহ নিয়ে কিংবা আল্লাহির দ্বীন কিংবা আকিদাহ মানহাজের প্রেজেন্টেশন নিয়ে সামনে এগিয়ে আসতে পারেআরে ! আপনি কি ভয় পাচ্ছেন? কাকে ভয় পাচ্ছেন? জানেন আল্লাহ কি বলেছেন? - আল্লাহ বলছেন - (ভাবার্থে(আমি এ কথা লিখে দিয়েছি আমি এবং আমার রাসুলগন ই বিজয়ী হবে। (এবং তাদের অনুসারী মুমিন বান্দা গন)

মিডিয়া জিহাদের জন্য আপনাকে খুব কঠিন কিছু করতে হবেনা। অনেক কিছু ব্যায় করতে হবেনা, আপনার জিন্দেগীর সমস্ত সময়ও এখানে দিতে হবেনা। বিশ্বাস করেন আপনি শুধু মাত্র আপনার অবসর বা হেলায় ফেলায় কাটিয়ে দেয়া সময়

গুলো দিয়েই এই মিডিয়া জিহাদে শরিক হতে পারেন ইনশা আল্লাহ। শায়েখ তামিম কিংবা বাবরি মাসজিদের ডকুমেন্টারি কিংবা জিহাদি ময়দানের ভিডিও গুলো কি আপনাকে উৎসাহিত করে? কেমন হবে যদি এমন ভিডিও আপনি নিজে তৈরি করলেন আর আল্লাহর রহমতে হাজার হাজার আল্লাহর বান্দা এই ভিডিও থেকে উপকৃত হল! আপনার ভিডিও দেখে উৎসাহি হয়ে কেউ একজন হিজরত করে ফেললো, কেউ একজন ১ লাখ টাকা খরচ করে একটা হাই কনফিগারেশনের ল্যাপটপ সাদাকাহ করলো, কেউ হয়ত গাফেল ছিলো দ্বীনের পথে ফিরে আসলো ! !কেমন হবে আপনার পুরষ্কার দ্বীনের পথে ফিরে আসা সেই ব্যক্তির সমস্ত আমল তো বতেই বরং আপনি তার বেচে থাকা প্রতিটি মুহূর্তের জন্য সাওয়াব পাবেন ইনশা আল্লাহ। কেন জানেন? কারণ সে আগে ছিলো কুফরের উপরে, তার প্রতিটি নিঃশ্বাস ছিলো কুফরের ভিতরে, কিন্ত এখন তার বেচে থাকা এবং প্রতিটি নিঃশ্বাস ঈমানের সাথেতার ঈমানের প্রতিটি মুহূর্ত ! আপনার জন্য সাদাকাহজি আর ! এটাও সম্ভব আপনার মিডিয়া কাজের মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ দিতে পারেন এই ব্যাপারে কোন সন্দেহ তো নাই ই, বরং আল্লাহ নিশ্চিত করেছেন, আল্লাহ দিবেন এবং আরো বেশি দিবেন। এখন দেখা দরকার আমি বা আপনি নিতে রাজি আছি কিনা।

কি এমন লাগে এই মিডিয়া জিহাদের জন্য?

১। একটা ল্যাপটপ বা পিসি কম বেশি সবার ই থাকে। না থাকলে কিনে নেয়া যায় যাদের সামর্থ্য আছে হাজার টাকা সেকেন্ড হ্যান্ড। অনেকে ২৫ খুব বেশি হলে) লাখ টাকা দিয়ে গেমিং ল্যাপটপ কিনে ঘন্টার পর ঘন্টা ভিডিও গেম খেলার জন্য(২। ডেইলি ২ঘন্টা সময় ৩/

৩। ইন্টারনেট (টাকা ১০০০ মাসে খুব বেশি হলে)

৪। কিছু দক্ষতা (না থাকলে শিখে নিবেন তাও ফ্রি ইউটিউব থেকে)

খুব বেশি কিছু কি? বসে বসে টিউটোরিয়াল দেখে কাজ শিখবেন এর জন্য আপনি জিহাদের কাজের পুরস্কার পাবেন, কারণ যখন জিহাদ ফরজ তখন জিহাদের প্রস্তুতিও ফরজআপনি চিন্তা করে দেখেন সারা দুনিয়া ব্যাপী আপনার মুসলিম ! ভাই বোনেরা, আর তাদের সন্তান রা কি পরিমান জুলুমের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, আর

আমি আপনি ঘরে বসে এই সামান্য কাজ টুকু আঞ্জাম দিতে পারবোনা! যদি না পারি তাহলে আসলে বলতে হয় আমাদের আর কিছু অবশিষ্ট নাই!

প্রিয় ভাই আমার আপনি কি নিয়ে এত ব্যাস্ত -? আপনার মোবাইলের দাম হয়ত ২৫ হাজার টাকা, আপনার বাইকের দাম ২ লাখ টাকা, আপনি আড্ডা, গুলতানি, খেলা দেখার পিছনে ব্যায় করেন ঘন্টার পর ঘন্টা কিন্তু যখন আমার মা বোনদের শেষ করে দেয়া হচ্ছে, তাদের নিষ্পাপ শিশুদের হত্যা করা হচ্ছে নির্বিচারে তখন কি আপনাকে উদাসীন করে রাখলো? আমি আপনাকেই বলছি? আপনি কি আল্লাহ আর তাঁর কিতাব বিশ্বাস করেন? যদি করেন তাহলে আপনি নিশ্চয়ই জানেন আল্লাহ কি বলেছেন? আল্লাহ বলেছেন - "তোমাদের কি হয়েছে যে তোমরা আল্লাহর পথে এবং অসহায় নারী পুরুষ আর শিশুদের রক্ষার জন্য লড়াই করবে না ... আয়াতের শেষ পর্যন্ত ৭৫ নিসা))

জি, ঠিক তাই। এটাই আল্লাহ বলেছেন। এর মাঝে আর অন্য কিছু নাই। যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই দেখতে পারেন এটা কুরআন কোন মুফতি ফুলানের কথা নয় যে - সরকার - বদলের সাথে সাথে ফুলানের ফাতওয়া ও বদল হয়ে যাবে।

তাহলে এবার বলেন আসেন আমরা সিরিয়াস হই -, নিজেকে প্রশ্ন করি আর কি আমাকে আটকে রেখেছে? আমরা আল্লাহর কাছে কি জবাব দিব ভাই? আমাদের ভাই বোনেরা আর্তনাদ করে বলে -ওহে মুসলিম উম্মাহ, তোমরা কি আমাদের ভুলে গেলে? আমাদের অন্তত ভুলে যেওনা, অন্তত তোমাদের কথার মাঝে আমাদের শরীক রাখো। আমাদের জবান তো অনেক দুরের কথা, আমাদের জিন্দেগীই তো আজ এখানে অবরুদ্ধ - তোমরা অন্তত আমাদের কে ভুলে যেওনা, আমাদের ব্যাপারে তোমরা কথা বল। সবাই কে জানিয়ে দাও আজ আমাদের সাথে কি হচ্ছে!

কি জবাব দিব ভাই সেদিন, যেদিন আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে! মুসলিম উম্মাহর রক্তের চেয়েও কি আমার ঐ দুই ঘন্টার বিনোদন বেশি মুল্যবান হয়ে গেল? আমার বোনের ইজ্জতের চেয়ে কি আমার বাইকের মুল্য বেশি হয়ে গেল?

আমরা ছিলাম এক উম্মাহ। আমরা এখনো এক উম্মাহ। এটাই আমাদের শক্তি। এক হোন। আপনি নিজে এবং আপনার মত যারা, তাদের নিয়ে এক হোন। আপনার সামর্থ্য আছে কিন্তু সময় নাই, আপনি যার সময় আছে তাকে সাহায্য

করেন। আপনার গেমিং ল্যাপটপ আছে কিন্তু আপনি কাজ পারেন না আবার আরেকজন আছে কাজ পারে কন্তু ল্যাপটপ নাই। আপনার ল্যাপটপ আপনার ভাইকে দিয়ে দেন, আর বলেন ভাই তুমি ভিডিও বানাও ডিও বানায়ে এই ভি-ল্যাপটপের মাদারবোর্ড গরম করে পুড়ায়ে ফেল আমি আরেক টা ল্যাপটপ কিনে দিবো।

প্রিয় ভাই, আপনি একা না। আপনি নিজেকে একা ভাবছেন কারণ এটাই কাফের রা আপনাকে ভাবতে শিখিয়েছে তাই। আমি, আপনি ঐ বিশ্বাসের মানুষ না। আপনি পারছেন না ভালো কথা অন্য কে নিয়ে পারার চেষ্টা করেন। কেউ না কেউ পারবেই, পারতেই হবে। কারণ এটাই এই উম্মাহর সফলতার অনেক বড় চাবি। এই উম্মাহ এক।

আজ, এখুনি নিয়াত করেন শুরু করেন আল্লাহ রাস্তা করে দিবেন -, ব্যাবস্থা করে দিবেন সহজ করে দিবেন। আপনাকে শুধু শুরু টা করতে হবে।

আপনারা একটা টার্গেট নেন আমি নেক্সট এক মাসের মধ্যে রাসুল সাঃ সিরাত নিয়ে একটা ১০ মিনিট এর ভিডিও ক্লিপ বানাবো ইনশাআল্লাহ, এটা হতে পারে আপনার শুরু। এর পরে সেই ভিডিও ফেসবুকে শেয়ার করে দেন। সাথে অন্যকে আপনার উৎসাহী করার জন্য আপনার এই পথচলার কিছু সংক্ষিপ্ত বিবরন দিয়ে দেন, যেন অন্য কেউ ও আপনার মত উৎসাহী হতে পারে। এরপরে আপনি যখন সাহস পেয়ে গেলেন তখন আর কোন পিছনে ফিরে দেখা নাই ইনশাআল্লাহ।

* আপনার পরিচিত কাউকে লেখাটি পড়তে দেন বা সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেন হয়ত তারা উৎসাহী হবেন ইনশাআল্লাহ

আমার সামর্থ্য তো শুধু এতটুকুই যে যা আমি জানি তা বলে যাওয়া। আশা রাখি আমার রব্ব আমাকে নিরাশ করবেন না।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১৮১৮

জি ভাই, ভিডিও এডিটিং এর কাজ তো করতে চাই ... কিন্তু কীভাবে?

s_forayeji

Moderator

১২-২২-২০১৮

বিসমিল্লাহ ওয়াস সালাতু আস সালাম আলা রাসুলিল্লাহ

আলহামদুলিল্লাহ গত পোস্টে মিডিয়ার গুরুত্ব এবং এর প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে আল্লাহ কিছু কথা লেখার তাউফিক দিয়েছিলেন। সেখানে ভাইরা জানতে চেয়েছিলেন কিভাবে ভিডিও এডিটিং করতে হয়? বা কিভাবে এই কাজ শুরু করা যায় ... এমন। অনেকে আবার মিডিয়ার ভাইদের দিকে কিছুটা নরম অভিযোগ তুলেছেন - এই ব্যাপারে যে মিডিয়ার ভাইরা সাহায্য করেন না। আসলে বিষয় টা এমন না। উনারা আসলে আপ্রান সাহায্য করতেই চান, কিন্তু নিজেদের জিম্মাদারি শেষ করতেই উনাদের যথেষ্ট সময় চলে যায়।

যাই হোক - এই লেখায় ইনশাআল্লাহ আমি আপনাদের কিছুটা ধারনা দেয়ার চেস্টা করব, কিভাবে ভিডিও এডিটিং এর কাজটা শুরু করা যায়। এর আগে আমাদের কিছু বেসিক বিষয় মাথায় রাখা দরকার।

১। আপনি এক দিনে প্রফেশনাল ভিডিও মেকার হয়ে যাবেন এমন না, তাই আপনাকে ধৈর্যের সাথে এই কাজে লেগে থাকতে হবে।

২। এখুনি সব এক সাথে করতে হবে পারতে হবে এমন না, আপনি ৩ মাস সময় নেন। ৩ মাস সময় নিয়ে আগে শিখেন কিভাবে কাজ টা করতে হয়। আপনি বিশ্বাস করেন আপনি যদি প্রতিদিন মাত্র ২ ঘন্টা সময় দেন এই ভিডিও এডিটিং এর পিছনে ইনশাআল্লাহ এক মাসে আপনি সুন্দর সুন্দর ভিডিও বানানো শিখে যাবেন। এই কাজটাই এমন। নিজে নিজে টুকটাক করে শিখতে হয়।

৩। নিজের নিয়াত এবং লক্ষ্য ঠিক করেন। আপনি কেন এই কাজ করতে চান? আর আপনি কি করতে চান।

এবার আসেন মূল বিষয়ে –

এই কাজের জন্য কি কি লাগে?

১। ল্যাপটপ - কোর আই ৫, থার্ড জেনারেশন বা এর উপরে। র‍্যাম মিনিমাম ৪ জিবি, গ্রাফিক্স থাকলে ভালো না থাকলে ও আপাতত সমস্যা নাই ইনশাআল্লাহ।

২। সফটওয়ার - অনেক ফ্রি সফটওয়ার আছে। এত কিছু একসাথে দেখতে গেলে মাথা ঘুরাতে পারে। আপনারা যারা দীর্ঘমেয়াদি এবং প্রফেশনাল কাজ শিখতে চান তারা এডোবি প্রিমিয়ার প্রো সিসি বা এরকম কিছু দিয়ে শুরু করতে পারেন। এক্ষেত্রে এটা বলা ভালো যে, আপনি যদি একেবারেই নতুন হয়ে থাকেন তাহলে এটা একটু কঠিন মনে হতে পারে। সেক্ষেত্রে আপনারা আমার মত সহজ কিছু

ব্যাবহার করতে পারেন যেমন ফিলমোরা Filmora, এটা ফ্রি এবং বেশ ভালো আলহামদুলিল্লাহ। ২০০/২৫০ টাকা খরচ করলে এই সফটওয়ার এর ফুল ভার্সন ও কিনতে পারবেন (ক্র্যাক)। বিভিন্ন সিডি ডিভিডি বিক্রি করে এমন বড় কোন দোকানে এগুলো পাওয়া যায়। আইডিবি, বসুন্ধরা, ইস্টার্ন প্লাজা, মাল্টিপ্ল্যানে এগুলো পাবেন ইনশা আল্লাহ।

৩। স্ক্রিপ্ট রাইটিং - এই বিষয় টি হচ্ছে আপনি যে ভিডিও টি বানাতে চান, তার জন্য একটি গল্প দরকার। আপনার ভিডিওটির গল্প কি হবে? এই বিষয় টি হচ্ছে স্ক্রিপ্ট রাইটিং। অর্থাৎ আপনি ভিডিও তে যা উপস্থাপন করতে চান তার একটা বর্ণনা সংক্ষেপে লিখে ফেলেন। নেটে এই বেপারে অনেক রকম টিপস পাবেন।

যেমন এখানে একটা ছোট উদাহরন দেই - আপনি **বাংলাদেশের যুব সমাজের অবক্ষয়** নিয়ে একটি ভিডিও বানাতে চান। এখন ১০ মিনিটের ভিডিও তে আপনি তো সব কিছু দেখাতে পারবেন না। তাহলে এই ১০ মিনিটের ভিডিও তে আপনি কি কি দেখাতে চান এবং কি গল্পের মাধ্যমে দেখাতে চান তা লিখে ফেলেন।

৪। ম্যাটেরিয়ালস কালেকশন - অর্থাৎ আপনার স্ক্রিপ্ট লেখা শেষ হলে এখন আপনি যে গল্প দেখাতে চান সেই গল্পের উপাদান খুজতে হবে, অর্থাৎ বিভিন্ন ক্লিপ্স, ইমেজ, অডিও এসব। এখন এগুলো **আপনার গল্পের সাথে যত ম্যাচ করবে আপনার ভিডিও তত সুন্দর হবে ইনশাআল্লাহ।** তাই আপনাকে আপনার গল্পের সাথে মিলে এমন সব ম্যাটেরিয়ালস খুজতে হবে। এগুলো কে বলা হয় **র ম্যাটেরিয়ালস।**

৫। এডিটিং - এর পরে আপনি সফটওয়ারে ভিডিও এডিটিং শুরু করবেন এই র ম্যাটেরিয়ালস গুলো নিয়ে।

৬। হেল্প/টিউটোরিয়াল - ধরে নিচ্ছি আপনি ফিলমোরা দিয়ে কাজ করবেন ইনশা আল্লাহ, তাই এই কাজ শুরু করার আগে ইউটিউবে ফিলমোরার বিভিন্ন টিউটরিয়াল দেখে নিতে পারেন ইনশা আল্লাহ।

৭। প্রোডাকশন - এরপরে বিসমিল্লাহ বলে নিজের প্রথম ভিডিও তৈরি করে ফেলেন ইনশা আল্লাহ।

ওয়ামা তাউফিকি ইল্লা বিল্লাহ

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১৮৪৯

*****